TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE
ESTD-2016

BANSDRONI
Hridhi
2019

Here effort counts

HRIDHI
initiative

www.bansdronihridhi.in

BANSDRONI HRIDHI

GOVT REGD NO: S/2L/No.58177 OF 2016-2017

(Under West Bengal Society Act XXVI of 1961)

ADDRESS: 88, SUBODH GARDEN, BANSDRONI,

KOLKATA – 700070

GOVERNING BODY MEMBERS FOR THE YEAR 2018-2019

PRESIDENT	: MRS. UMA CHAKRABARTI
VICE-PRESIDENT	: MRS. PIYALI CHOWDHURY
SECRETARY	: MRS. SAGARIKA GHOSH
ASST. SECRETARY	: MR. JAGANNATH DAS
TREASURER	: MR. SUMAN GHOSH
MEMBER	: MR. DIPESH CHAKRABORTY
MEMBER	: MRS. DYUTILEKHA MUKHERJEE
MEMBER	: MR. BHASKAR ROY CHOWDHURY
MEMBER	: MRS. ARCHANA DAS

সমাজ ভাবনা ও আমরা ঃ সভাপতির কলম থেকে

উমা চক্রবর্তী

যুগ যুগান্তরের অক্লান্ত সাধানায় মানুষ গড়ে তুলেছে তার সাধের সমাজ, রচনা করেছে সভাতার ভিত্তিপ্রস্তর। বর্বরতার নিবিড় ঘন অন্ধকারের মধ্যে মানুষের মনে যে দিন সামাজিক বোধের প্রথম সূর্যোদয় হল, মানুষ সে দিন নবলব্ধ চেতনায় উপলব্ধি করল - Live and Let live - বাঁচো এবং বাঁচতে দাও। মধ্যে মধ্যে বহুকাল গুমোটের পর হঠাৎ একদিন অন্তর থেকে একটা ঝড়ের বেগ আমাদের স্বার্থ ও সুবিধা দ্বারা পরিবৃত আত্মকেন্দ্রিকতার জাল ছিন্ন করে আরাম ও অভ্যাসের বাইরে ক্ষণকালের জন্য আকর্ষণ করে। উপলব্ধি করিয়ে দেয় যোগবাশিষ্টের শ্লোক- "ভরবোহ পি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণ ঃ স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি"—

তরুলতাও জীবন ধারণ করে, পশুপক্ষীও জীবন ধারণ করে, কিন্তু সেই প্রকৃত রূপে জীবিত যে - 'মনন' - এর দ্বারা জীবিত থাকে । মনের যে জীবন, শাস্ত্রের ভাষায় যা 'মনন' সেই রূপ মন-ই এক হয়ে সমস্ত ধরণের তুচ্ছতা ও অসংবদ্ধতা থেকে মুক্ত হয়ে মান ও হুশ সম্পন্ন মানুষ হয়ে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ থাকে।

আমাদের প্রাণের, বুদ্ধির, সৌন্দর্য বোধের, মঙ্গ প্রবৃত্তির মূল ধর্ম ই এই যে, সে কেবলমাত্র নেবে তা নয়, সে ত্যাগ ও করবে।

সামাজিক কর্মকান্ডে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ আসেন। একজন মানুষ যিনি ধারাবাহিক ভাবে বা পর্যায়ক্রমে সামাজিক কর্মকান্ডের পথকে গতিময় করেছেন তার প্রতি ব্যবহার ও আচরণবিধি হতে হবে আন্তরিক।

বর্তমান কর্মসূচী গুলোতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকেই তৈরী হয় ভবিষ্যতের সমাজকর্মী ও সংগঠক। সামাজিক কাজে ইচ্ছুক মানসিকতাকে যেন অহংকারী সমাজসেবী মন, গ্রাস করতে না পারে। একজন সমাজ কর্মীর মানসিকতা যেন সযত্নে লালিত হয় এই চিন্তা ধারায় - "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"।

সমমনস্ক মানসিকতাই সংগঠনের ছত্রছায়ায় সমাজ কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করে এবং কর্মসূচীকে সফল করে।

নবীন কর্মীদের প্রকৃত অর্থেই আমরা যেন মনের দুয়ার খুলে স্বাগত জানাতে পারি। কর্মীদের দ্বিধা, সংকোচ ও অসুবিধায় মূহূর্তে পাশে দাঁড়াতে পারি।

আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি অথচ পরের ত্রুটি নিয়ে আকাশ বিদীর্ণ করি। কাজের ক্ষেত্রে যারা নবীন, ত্রুটি বিচ্যুতি তো তাদের হবেই। কথিত আছে - 'ভুল হয় না শয়তানের।'

দৃঢ় মানসিকতার নবীন প্রবীণের শ্রেনী বৈষম্যকে প্রতিহত করতে হবে। বহুমাত্রিক চিন্তা ভাবনা গুলির পারস্পরিক বিনিময়ই সামাজিক কর্মসুচীর ভিতকে সুদৃঢ় করে। পুরাতনের সাথে নূতনের সেতুবন্ধন ই সংগঠন ও কর্মসূচীকে নিয়ে যায় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে। কাজের সাথে লক্ষ্যের, লক্ষ্যের সাথে মনের সচেতনতার সজীব বন্ধন স্থাপিত করতে হবে।

আমরা যখন কোনো সফল কর্মসূচীর ইতিহাস চর্চা করি, তখন তার সাফল্যে দিকে চোখ পড়ে। সফলতার প্রনালীও চর্চা করি, কেবলমাত্র একটা কথা মনে রাখি না - যেকোনো সাফল্যই সম্পূর্ণ অসম্ভব যদি তার ভূমিকাতেই থাকে বিচ্ছিন্নতা।

মানুষের ঐক্যতত্ত্বের উপলব্ধি যেখানে দুর্বল সেখানে সেই দুর্বলতা নানা ব্যাধির আকার ধরে সংগঠন ও কর্মসূচীর ধারাকে ব্যাহত করে।

আন্তরিক স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসকে পাথেয় করে তাই বন্ধু আসুন - বাঁশদ্রোণী হৃদি - র আঙিনায় আমরা এই শপথ গ্রহণ করি - সংগচ্ছ ধ্বং- এক হয়ে চলব।

সম্পাদিকার কলমে

সাগরিকা ঘোষ

দয়া করে আর কিছুদিন সময় দিন আমায় ..... একটি বাচ্চা মেয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় শিক্ষিকার কাছে আরো কিছুটা দিন সময় চেয়ে নিচ্ছে স্কুল ফী দেওয়ার জন্যে। চোখদুটিতে হাজারও অসহায়তা ভীড় করে আছে........ আদৌ কি সে পারবে .... বাবা সেই কবেই মারা গেছেন আর মা যে লোকের বাড়ি কাজ করেন ....দুবেলা ঠিক মতন যার খাওয়াই জোটে না .... পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া টা তো তার কাছে রীতি মতন বিলাসিতা।

এটাতে একটা ঘটনা, এই রকম হাজার হাজার বাচ্চা ছেলে মেয়ে প্রতিদিন আমাদের সমাজকে নানা রকমের প্রশ্নের সামনে দাঁড় করায়।

প্রাথমিকের গন্ডি পেরিয়ে আমি তখন সবে নতুন একটি স্কুলে পঞ্চম শ্রেনীতে ভর্তি হয়েছি। মা শিখিয়েছিলেন স্বামীজির বাণী 'জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর" বাবার কাছ থেকে টিফিন খাওয়ার জন্যে বড়াদ্দ ছিল রোজ ৫ টাকা। চট করে হিসাব করে ফেলাম মাস গেল ১৫০ টাকা। কিন্তু সে তো মাস শেষ হলে তবেই, একজন শিক্ষিকা .... তাঁকে পুরো বিষয়টি জানিয়ে অনুরোধ করলাম স্কুল কর্তৃপক্ষ যেন মাস শেষ হওয়া পর্যন্ত সময় দেন আমার সেই বন্ধুটিকে .... সময় মিলল.............

শুরু হলো আমার টিফিন না খেয়ে টাকা জমানো। এরপর ধীরে ধীরে টাকা জমিয়ে ওই বন্ধুটির জামাও কিনে দিয়েছি আর বছর বছর স্কুল ফীটাও.......... সেই আমার পথচলার শুরু........

ঐকিকপ্রচেষ্টাতেই যতটা পারা যায় চেষ্ঠা করছিলাম মানুষের পাশে দাঁড়ানোর। ২০১৭ র মাঝামাঝি সময় কোন একন সন্ধ্যায় হৃদির সঙ্গে আমার নতুনভাবে পথচলা শুরু হল .... একটা প্লাটফর্ম পেলাম আরো বেশি করে মানুষের জন্য কিছু করার বা ভাববার ....

এর আগেও যে কোনো এন.জি.ওর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ডাক পাইনি তা নয়, কিন্তু সে সবের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে লুকিয়ে ছিল ভবিষ্যতের পকেট পূরণের গল্পও। তাদের উদ্দেশ্য আদতে মানুষের পাশে দাঁড়ানো নয়, নিজেদের আখের গোছানো। শুনতে খারাপ লাগলেও এটাই রূঢ় বাস্তব, আর ঠিক এই জায়গাতেই হৃদি সবার থেকে আলাদা ও সতন্ত্র। হৃদি শুধু মানুষের কথা ভাবে, ভাবে সেই মানুষগুলোর কথা যারা কোনো না কোনোভাবে সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন, যারা আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়েছেন, যাদের বাড়ির লোক থেকেও নেই, যে সব শিশুরা দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত, অথবা রোগব্যাধি হওয়ার কারণে সমাজ যাদের দূরে সরিয়ে দিয়েছে, হৃদি

তাদেরও আপন করে কাছে টেনে নিয়েছে, পাশে দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয় প্রাকৃতিক দুর্যোগেও মানুষ পাশে পেয়েছে হৃদিকে। স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রসারেও পিছিয়ে নেই হৃদি।

যদিও হৃদির মূল লক্ষ্য 'oldphanage' কিন্তু এই সব কাজগুলোই সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর এক একটি ধাপ। ।একটু একটু করে আসল লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে হৃদি ।২০১৬ সালের ২৪শে র্মাচ জন্ম হয়েছে হৃদির, সবে তো তার বয়স তিন, কিন্তু এরই মধ্যে সে পারি দিয়েছে অনেকটা পথ, করে ফেলেছে এমন অনেক কাজ যা এত ছোট বয়স হয়ত অনেকেই করতে পারে না। আসলে বেশ কিছু মানুষের একান্ত ইচ্ছা ও সৎ প্রচেষ্টার ফসল হলো আজকের এই হৃদি .... হৃদি অর্থাৎ হৃদয় থেকে, তাই এখানে শুধুই আছে ভালোবাসার ছোঁয়া, মমতার স্পর্শ যে ছোঁয়ার, সে স্পর্শে আশার আলো দেখতে পায় সমাজের সেইসব মানুষগুলি যারা বঞ্চিত / অবহেলিত।

যেদিন হৃদি র 'oldphanage' শুরু হয়ে যাবে সেদিন অনেক বাচ্চা ছেলে মেয়ে হয়তো বাবামাকে পাবে না কিন্তু দাদু/ দিদার আদর তাদের সেই দুঃখ অনেকটাই ভুলিয়ে দেবে, আর শেষ বয়সে এসে এই বয়স্ক মানুষগুলো ফিরে পাবে নাতি নাতনীদের ভালোবাসা। তবে এতটা পথ পাড়ি দেওয়া কখনোই হৃদির পক্ষে সম্ভব হতনা যদি না সকল সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা পাওয়া যেত। আগামী দিনগুলিতে হৃদি এই ভাবেই সকল সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাবে তার লক্ষ পূরণের পথে।

ABOUT US

BANSDRONI HRIDHI

We express our deep appreciation and sincere gratitude for your interest in our activities. Enabling you to know more about us and our activities, we give you a brief background of Bansdroni Hridhi (Where Effort counts) :

Bansdroni Hridhi is an organization started their journey since 2016 ,where people from various sectors of the society have come together with the belief that change is possible and can happen against all odds. Despite of their diverse position, all the members have a common vision - to stand beside the underprivileged section of the society in the times of need with an honest and sincere effort.

Our Mission: To inspire breakthroughs and permanent changes in the way our society treats children and aged people, to improve the health and overall quality of the lives of elderly citizens who are distanced from their families, to protect the abandoned and vulnerable children from abuse and/or neglect and support them with food, shelter, education, self development skills and health care, a Mobile Cloth Bank and an Ambulance Service

OUR DREAM - OLDPHANAGE:

Our long term dream is to house an orphanage and an old-age home in the same premises so that they become interdependent and helpful to each other.

To turn this dream into reality, we have completed several projects such as:

- **Support to Orphans:**

24th March 2016 we started our journey with Ashiyana Orphanage with snacks followed by lunch & health checkup camp; visited "Dakshin Kalikata Sevasram" with lunch and handed over snacks & other items to the authority.

- **Flood Relief:**

In September, 2017 we sent food, medicine and clothes as relief to flood affected people of Balurghat, Malda & Ghoksadanga, Coochbeher

- **Financial support to Poor but Meritorious Student:**

Paid school & college admission fees for :Tapas Das, Jalpaiguri; Tapan Das & Subhadeep Dawn, Barjora; Sarthak Laha, Katwa; Akash Bharadwaj, Barjora , Sambhu Das, Muraliganj ; Akash Singha, Daspara

24/06/2018 09:19

6/06/2018 09:16

BANSDRONI HRIDHI
for Durga Puja to CLHIV

ANWESHA CLINIC

08/03/2018

Medical Support:

Financial support to

~ 3-1/2 year old Chitralekha Haldar suffering from Beta Thalassemia Major;

~ 8 year old Snigdha Das suffering from Lymphoblastic Leukemia ;

~ 5 month old boy Ankush Saha, suffering from cancer ;

~ Mrs. Krishna Banerjee of Burdwan for her treatment of breast cancer;

~ Mr Amal Dey for his heart treatment ;

~ Mr Dilip Kumar Das for his neurological treatment ;

Cloth Distribution:

We distributed old / new clothes and blankets to the –

~ 100 villagers of Gangajalghati, Bankura District;

~ Woollen garments to the aged people residing around Dumdum Station;

~ 80 Nos. Slum + Street dwellers around Dhakuria Park , Kolkata;

~ 500 tea garden workers in various closed tea estates of North Bengal;

~ 50 aged and ailing patients who are uncared for by their families and are staying at R.G. Kar Hospital, Barasat Govt. Hospital and S. N. P. Hospital;

~ 150 tribal people of sitatoli and surjyapara;

~ 125 Blanket to TOTOPARA village in Alipurduar;

~ 199 children who are living with HIV/AIDS, from North 24 Parganas, South 24 Parganas, Kolkata, Bankura and Purulia district.

Voluntary Blood donation Camp:

In association with "Udayan Club, Bikramgarh" at Udayan Club Premises

Free Sanitary Napkin, Tooth Paste Distribution Awareness Campaign and health checkup, :

Amongst **333 nos of women** at konkonia village, Malda, Harischandrapur; and among **320 nos of girls and women** of Srjyopara, Shikatuli and Bhuna villages, Maldah

Special Day Celebration :

on the eve of Independence day distributed fruits and sweets to 176 children in the Children's Ward at SSKM Hospital. On **13.01.2019** we celebrated annual picnic with 41 orphan and differently abled children and distributed sweaters among those children

And the Journey to be continued..................

আমরা বাঁশদ্রোণী হৃদি

দীপেশ চক্রবর্তী

সালটা ২০১৬, জন্য পাঁচ ছয় বন্ধু মলে বসেছিলাম কলেজ স্ট্রীটের কফি হাউসে। তার আগে বেশ কয়েকদিন ধরে আমরা ক'জন হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপে একটা বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করেছিলাম। নিজেদের ভাবনার আগুনকে খানিকটা উস্কে দিতেই আমাদের এই কফি হাউসের অভিযান।

আমরা জীবনে সবাই প্রতিষ্ঠিত। জীবনের কাছে এই বয়সে এসে যা পেয়েছি তাতেই তৃপ্ত অনেকখানি। আজ নিজেদের অবসরে কিছু অন্যরকম ভালোলাগাকে সময় দিলে মন্দ কী ? আলোচন করে ঠিক হল আমাদের কিছু সমাজ সেবামূলক কাজ করে উচিত। ছোট করে শুরু করে তারপর ভাবা যাবে। সেই মত সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন এর কাজের চেষ্টা শুরু হল। কিন্তু এর মধ্যেই যে বন্ধুকে সকলে নেতা বানিয়ে বসে আছি সেই পিছু হটে গেল । শুধু তাই নয় আমাদের সাথে আর কোনো যোগাযোগাই রাখল না। শুরতেই পেলাম ধাক্কা, তবে কি কিছুই হবে না ? সেটা আবার আমার ধাতে নেই, সিদ্ধান্ত যখন হয়ে গেছে তখন কাজ করবই। তাই বাকিদের বললাম চল আমরা মিলেই শুরু করি।

কিন্তু মুখে বলাটা যত সহজ লেগেছিল, কাজ করাটা কিন্তু ততটাই কঠিন হয়ে উঠলো। কোথা থেকে কী দিয়ে শুরু করি? সবাই মিলে খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলাম একটি অনাথ আশ্রম, যাদের সাহায্যের দরকার। যোগাযোগ করলাম তাদের সাথে। জানালাম আমাদের উদ্দেশ্য, সঙ্গে জানালাম আমাদের সীমিত সামর্থ্যের কথা। ঠিক হলো তাদের ১২০ জন বাচ্চার জন্য এক মাসের টিফিন নিয়ে যাব আমরা ২৪শে মার্চ ২০১৬ দুপুরে। সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পরলাম, পিফিনের লিস্ট তৈরি করে ফেললাম। তারপর বারাসাতের একজন সহৃদয় দোকানদারের সাহায্যে আমাদের সামর্থ্য মত আমরা সব নিয়ে পৌঁছে গেলাম সেই অনাথ আশ্রমে।

বাচ্চাগুলো তখন দুপুরের খাবার খাচ্ছিল, শুধুই ডাল ভাত। কিন্তু ওই সামান্য আহারেও তাদের তৃপ্তি যেন উপচে উঠেছে থালায়। মনে পড়ল নিজের ছেলেদের কথা। তাদের খাদ্য তালিকায় পুষ্টিকর মুখরোচক অনেক খাবার থাকলেও তাদের খাওয়াতে বাড়ির মধ্যে ছোট খাটো লায়লা আয়লা বয়ে যায়। সবার সাথেই কথা বলে ঠিক হলো বাচ্চাগুলোকে একদিন বিয়ে বাড়ির ভোজের মত খাবার খাওয়ালে কেমন হয়। প্রস্তাব দিতেই অনাথ আশ্রমের প্রধানও সাথে সাথে রাজি। বলে তো ফেললাম, কিন্তু কাজটা কতটা কঠিন সেটা বুঝলাম কয়েকদিনের মধ্যেই। ১২০ জনের জন্য ক্যাটেরার ৩৫০ টাকা প্লেট হিসাবে ৪২০০০ টাকার বাজেট দিল।

সেই মুহুর্তে আমাদের সবার মাথায় হাত, সেটা কীভাবে সম্ভব! অফিসের কাজে রাঁচি এসেছি।

কাজ সেরে সন্ধ্যাবেলা হোটেল বাস অনেকক্ষণ চিন্তাভাবনা করলাম সকলে, মুঠোফোনের অর্ন্তজালেই, কিন্তু কোনো রাস্তা বেরল না। রাতে ঘুমোতে যাওয়ার সময় হঠাৎ আমার তুতাই এর কথা মনে পড়ল, আমার ছেলের একটা অনুষ্ঠানে ভালো খাবার বানিয়েছিল। আশা ছিল না খুব একটা বেশি কিছুর, তবু সব জানিয়ে তুতাইকে একটা মেসেজ করে শুয়ে পরলাম, তখন রাত প্রায় ১২টা। ঠিক ৩ মিনিটের মাথায় একটা উত্তর এল- তুতাই লিখেছে "তোমরা যে কাজটা করছো এর কোনো রেট হয় না, তোমার যা পারবে দিও, বাকিটা আমার তরফ থেকে ডোনেশান"। এটা তো মিরাকেল। ভাবতেই পারছিলাম না কি হচ্ছে ? অতএব ২৪শে এপ্রিল ২০১৬ দিনটা পাকা হয়ে গেল।

অফিসের মিটিংয়ে মুম্বই গেছি। ঠিক হয়েছে ২৩শে এপ্রিল রাতে ফিরে, ২৪ শের সকালে আমি খাবার গুলো নিয়ে কোলকাতা এয়ারপোর্টের ১নং গেটে পৌঁছে যবো সকাল ১১ টায়, বাকি সবাই সেখানে এসে যোগ দেবে আমার সাথে।প্রায় ১২ জন যাবে আমাদের এই কাজের কথা শুনে। জীবনে ২০১৬ র ২৩শে এপ্রিলের অভিজ্ঞতা আমি কোনোদিন ভুলবো না। সন্ধ্যা পৌনে আটটার ফ্লাইট ধরার কথা মুম্বই থেকে। সেদিন যেন মুম্বইয়ের সকল মানুষই পথে বেরিয়ে পড়েছেন, কোন না কোন অজুহাতে, রাস্তায় শুধু গাড়ির আলোরা ভিড় করেছে। অনেক কষ্টে যখন মুম্বই এয়ারপোর্টে পৌঁছলাম তখন সোয়া সাতটা বাজছে। আমি মনে মনে ভাবছি ফ্লাইট যদি না পাই তাহলে পরের দিন কি হবে ? কারণ অভিজ্ঞতা আছে চল্লিশ মিনিট আগে এসেও বোর্ডিং পাস পাইনি লেট হয়েছে বলে। মাথা ঠিক মত কাজ করছিল না। কিন্তু ওপরওয়ালা অন্য কিছু ভেবেছিলেন আমার জন্য। অদ্ভুতভাবে কোনো প্রশ্ন না করে বোর্ডিং পাস দিয়ে দিল। ব্যাটারী চালিত গাড়ি করে প্রায় কোলে করে ফ্লাইট এর সিটে যখন বসিয়ে দিয়ে গেল, তখন বিশ্বাস হচ্ছিল না কি হচ্ছে। শেষ পনেরো মিনিট ধরে যেন কোনো মিরাকেল হয়ে গেল আমার সাথে। কী ভাবে হল? কে করল? জানি না, হয়তো পরের দিনের জন্য কেউ করিয়ে দিল।

২৪শের কাজও মিটে গেল। তারপর আমরাও বুঝতে পারলাম সৎ প্রচেষ্টা থাকলে কোনো ভালো কাজ কিছুতেই আটকায় না। এরপর ? খবর পেলাম একটা থ্যালাসেমিয়া বাচ্চা মেয়ের বোন্‌ম্যারে ট্রান্সপ্লান্ট হবে, ২২ লক্ষ টাকা দরকার গরিব বাবার। অন্য অনেকের মত আমরাও কিছু সাহায্য করবো বলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। পঁশিচ হাজার টাকা সাহায্য করতে পারব ভেবে নেমে পড়লাম টাকা তুলতে। এক লক্ষ সতেরো হাজার টাকা তুলে দিলাম। আমাদের কাজের কথা শুনে বন্ধুরা, আত্মীয়রা সবাই যে যা পারে সাহায্য করল। কোনো জোর নেই কারোর উপর। সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন হল, ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট হল, প্যানকার্ড হল, এন জি ও দর্পনে রেজিস্ট্রেশন হল। আর সাথে সাথে কাজও চলতে লাগল।

অনাথআশ্রম এর বাচ্চাদের হেলথ চেকআপ, বাঁকুড়ার গঙ্গাজল ঘাঁটি, দমদম স্টেশন, আলিপুরদুয়ার এর দিমদিমা বন্ধ চা বাগান, টোটোপারা, মালদহতে জামাকাপড়, কম্বল বিতরণ, ২০১৭ এর বন্যাত্রাণে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের ছেলেরা। ত্রাণ বিলি হল জলপাইগুড়ি, বালুরঘাট, মাহদহতে, এস.এস.কে.এম হাসপাতালের শিশুবিভাগে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে ফলমূল বিতরণ, দুর্গা পুজোতে নতুন জামাকাপড় দেওয়া হল। আর.জি.কর মেডিমেল কলেজ, বারাসাত জেলা হাসপাতা, শম্ভুনাথ পন্ডিত হাসপাতালের সেই সব রোগীদের যারা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছেন অনেক বছর ধরে । মালদহতে 'উওমেনস ডে' তে ফ্রি স্যানিটারি ন্যাপকিন ডিস্ট্রিবিউশন হল। এইচ.আই.ভি আক্রান্ত বাচ্চাদের মধ্যে নতুন জামাকাপড় বিতরণ হল দুর্গাপূজা আর কালীপূজা উপলক্ষ্যে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনাতে আরো কত কি য়ে হয়ে গেল এই তিন (৩) বছর সময়ে ভাবতেও অবাক লাগে আজ।

এই চলার পথ অনেক দুর্গম। যাদের নিয়ে শুরু করেছিলাম তাদের মধ্যে অনেক আজ চলে গেছেন, অনেক এসেছেন নতুন করে, নতুন চিন্তা ভাবনা নিয়ে। তাদের সবার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। জানি চলার পথে আসা যাওয়া চলবেই - কিন্তু চলাটা থামবে না এটাই প্রতিজ্ঞা।

সাথে থাকবে সৎ প্রচেষ্টা। সেটা করতে পারলেই আমরা খুশি। **ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস বলে গিয়েছিলেন — ফলের চিন্তা না করে কাজ করে যেতে, আমাদের সেটাই আদর্শ।**

আমাদের ওয়েবসাইট **(www.bansdronihridhi.in)** তৈরী করেছে আমাদের সদস্যরাই অনেক কম খরচে। এটাও সেই সৎ প্রচেষ্টারই ফল। সেই ওয়েবসাইটে আমাদের আর্থিক হিসেবে নিকেশ দেওয়া আছে। এটাও সেই সৎ প্রচেষ্টারই অঙ্গ।

আমাদের ২০১৯ এর বার্ষিক পিকনিকেও আমরা একটা সৎ প্রচেষ্টা করেছি মাত্র। কিছু অনাথ আর বিশেষ ভাবে সক্ষম বাচ্চাদের খাওয়ানো, তাদের সাথে খেলাধূলা, সোয়েটার বিতরণ এসবের মধ্যে দিয়ে একটা দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা পেয়েছি। আমরা এতেই সবাই খুশি। একইরকম ক্যান্সার, অঙ্গ প্রতিস্থাপন, এইচ.আই.ভি এর বিরুদ্ধে প্রচার করে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পও করেছিলাম ২০১৮ তে।

কিন্তু আসল স্বপ্ন বা লক্ষ্য যে অনেক বড়ো। আমরা সেটা কে বলি 'oldphanage' — বৃদ্ধাশ্রম আর অনাথআশ্রম এর মিলিত রূপ। দাদু দিদিমার কাছে নাতি-নাতনিদের ফিরিয়ে আনার প্রয়াস আর সবাটাই হবে, বিনামূল্যে তাদের জন্য। কোন ব্যবসা নয়। আমরা যোগাবো তাদের ভালো করে মাথা উঁচু করে বাঁচার জন্য যা যা দরকার। তারা ফিরিয়ে আনবেন তাদের আনন্দের দিনগুলো। যারা একটা পরিবারকে বুক দিয়ে আগলে রেখেছিল সেই লোকগুলোর শেষ বয়সে

এসে নিজেদের যেন একা না ভাবতে হয়। অন্যদিকে অনাথ বাচ্চাগুলো স্নেহ ভালবাসা পেয়ে বড় হয়ে সমাজের একজন যেন হয়ে ওঠে। তাদের জন্য থাকবে বিদ্যালয়, মেডিকেল ফেসিলিটি, লাইব্রেরি, এম্বুলেন্স সব কিছুর ব্যবস্থা এক ছাদের তলায়।

আর সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্যই, আমাদের সদস্যদের সেই দিনগুলোর জন্য মানসিক ভাবে তৈরী করার জন্য, আপনাদের কাছে পৌঁছানোর জন্য, আপনাদের পাশে পাবার জন্য আজকের এই কাজগুলো ছোট ছোট পদক্ষেপ।

এখানেই হৃদি স্বতন্ত্র, সৎ প্রচেষ্টা যার মূলধন, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন আর্থিক ব্যবস্থা যার বুনিয়াদ। আপনাদের একটি পয়সাও যাতে বাজে খরচ না হয় তার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

আমরা তো এগোলাম। এবার আপনিও আসুন না এগিয়ে। আপনারা না এগোলে এত বড় কাজ সম্পন্ন হবে কি করে ? আপনারাই তো হৃদির শক্তি। সমাজের থেকে যা পেয়েছি তার কিছুতো সবাইকে ফেরত দিয়ে যেতে হবে এই সমাজকেই । তা নয় কি ? তাই আর দেরী নয়..........................

হৃদি

ঝুমা মল্লিক

হৃদয়ে এক নতুন বীজের জন্ম হয়েছিল, তারপর

সময়ের সাথে সাথে তা চারাগাছ হয়েছে যত্নে।

আজ তা বটবৃক্ষের মতোই দাঁড়িয়ে আছে।

সবুজ পাতার দলে জন্ম নিয়েছে সবুজ সাথীরা।

হৃদয় মিশেছে কত কত হৃদয়ের সাথে।

"হৃদি" নামক বটবৃক্ষে আশ্রয় পেয়েছে কত কত

সমস্যার চারাগাছ, যত্নে।

নতুন নতুন স্বপ্নেরা জলদান করেছে চারাগাছে।

ইচ্ছেরা মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে আকাশে ডানা মেলার অপেক্ষায়।

এক নীল আকাশের মায়া।

মানুষ হয়ে মানুষকে ছুঁয়ে থাকার ইচ্ছে "হৃদি"।

মানুষের ভিড়ে মনুষ্যত্ব বাঁচিয়ে রাখার নাম "হৃদি"।

সমাজকে ভালবাসার নাম "হৃদি"।

মানুষকে ভালবাসার নাম "হৃদি"।

"হৃদি" হৃদয় ছুঁয়ে ছুঁয়ে বেঁচে থাকার আশীর্বাদ।

যাওয়া শুধুই যাওয়া নয়

সুরশ্রী ঘোষ সাহা

চলে আমাদের সকলকেই যেতে হবে। শুধু কেউ বড় তাড়াতাড়ি আর কেউ দেরীতে চড়বে গাড়ি। রবি ঠাকুরের মত "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই। কিন্তু তা কি পাই ? না, তা পাই না। বরং ইদানিং চলে যাবার জন্য কোন কারণ অকারণ কাল অকাল নেই। তাহলে চলুন না আমরা কিভাবে আরো থাকতে পারি তার চেষ্টা করি।

হ্যাঁ, এই থেকে যাওয়াটা শুধু একটু অন্যরকম। একদেহ থেকে ভিন্ন দেহে ছড়িবে এই থাকা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন 'শরীর শুধু শরীর, তোমার মন নাই কুসুম ?" আছে তো আমাদের সকলের একটা কুসুমিত মন আছে। যে মনটা কিন্তু মরে না। শত মরণও তাকে কেড়ে নিতে পারে না। ঠিক একটা দেহ খুঁজে আবার গুছিয়ে বাঁচতে শেখে সে। মন নাকি আত্মা যে নামেই ডাকি , সে যে অবিনশ্বর। শুধু শরীরটা পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

কিন্তু কেন পোড়াই আমরা তাকে ? আমরা তো তাকে বাঁচাতেও পারি। আমরাই পারি দেহদান করে তাকে নবজন্ম নবশরীর নবজীবন দিতে। আর তাতে বেঁচে যেতে পারে আরও অনেক জীবন যা খুবই সহজ যোগের রসায়ন। যেমন বীজ থেকে গাছ, গাছ থেকে ফল, ফল থেকে বীজ, বীজ থেকে আবার চারাগাছ। আমরাও কী এমন গাছ নই ? আমরাও যে প্রত্যেকে এক একটা বটবৃক্ষ। দীর্ঘায়ু নিয়ে পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়িয়ে আছি। আমার চোখ দিয়ে যাব যাকে সেই অক্ষিগোলক থেকে আমিই যে দেখবো এই সুন্দর পৃথিবীটাকে আরো আরো দীর্ঘদিন। আমার কিডনি দুটো দুজন আলাদা মানুষ ভাগ করে নেবে। হৃৎপিন্ড হয়ে যার বুকে গেঁথে যাব সেই তো আমারই তালে চলবে। কেন তাকে পোড়াই তবে ? আজ সে শরীর নিয়ে এত ভাবনা আমি চলে যাবার পরও সে আরো বাঁচুক না।

আগে মানুষ মরলে চারজন কাঁধে করে হরির নাম করে নিয়ে যেত, এখন কাঁচের দেয়াল তুলে গাড়ি করে চুপিসাড়ে সেই যাওয়া। আর তারপর হাজার নিয়মে বেঁধে ফেলে বাড়ির সদস্যদের কষ্ট দেওয়া। জানি না এত নিয়ম কারা বানিয়েছিল । একদম জানি না আবার তাও নয়। কিছু মানুষের স্বার্থ লুকিয়ে আছে এই সকল নিয়মের পিছনে। কিন্তু খুব অবাক হই একজন চলে গেলে তার বাড়ির সদস্যরা তেল শ্যাম্পুহীন শুষ্ক চুলে এক মুখ গোঁফদাড়ি নিয়ে বড় বড় নখ রেখে প্রোটিন ভিটামিন না খেয়ে অর্ধেক মাস শোক জ্ঞাপন করে সবশেষে মাথা মুড়িয়ে (অনেক জায়গায় ছেলে নাতি হাতি সকলেই) যে শ্রাদ্ধ শান্তি করে আর দুদিন ধরে হাসি মুখে সকল মানুষকে ডেকে চব্য চোষ্য লেহ্যপেয় খাওয়ার এর সঠিক অর্থ কী ? আবার এখানেই শেষ নয়

এক বছর ধরে ঘরে মন্দিরে পুজো নয়। বছর ফুরোলে আবার প্যান্ডেল খাটাতে হবে তার জন্য টাকা সরিয়ে রাখো। কেউ কেউ আবার নাকি দোষ পায় তাহলে তো হয়েই গেল। আমার এক আত্মীয়া বাংলাদেশের এক রক্তের সম্পর্কের আত্মীয় মারা যাওয়ার খবর পেয়ে পশ্চিমবঙ্গে বসে প্রচুর কাচাকাচি করেছিলেন এবং নিজে শীতের দিনে সেই ধকল না নিতে পেরে জ্বরে পড়ে আচমকা মারা যান। মৃত্যু পরবর্তী নিয়মশুরু থেকে নিয়মভঙ্গ পুরো ব্যাপারটাই তাই আমার খুব অপছন্দের।

আমি মনে করি মানুষকে বেঁচে থাকতে সম্মান দাও, ভালবাসা দাও আর তাকে পঞ্চভূতে বিলীন করার জন্য উঠে পড়ে না লেগে পঞ্চশরীরে ভাগ করে দাও। আত্মারাম তো খাঁচা ছাড়া হওয়ার সাথে সাথেই সরে পড়েছে ওই শরীর থেকে। ওর শান্তি চেয়ে দুফোঁটা চোখের চল ফেলে স্মরণ কর ও তাতেই খুশি হবে। আর অনেক বেশি উপকার হবে সেই মুখ গুলোর যাদের হাসি তুমি বাঁচিয়ে রেখে যাবে। আমি তো অঙ্গীকার বদ্ধ হচ্ছি আমার মরণোত্তর দেহদান করে যাব। তাই তো আমার যাওয়া হবে শুধুই যাওয়া নয়, বরং থেকে যাওয়া।

পিছিয়ে থাকা মানুষদের পাশে

দীপন রায়

বহুদিন ধরেই একটা ভাবনা ছিল যে দরিদ্র, দুঃস্থ মানুষদের জন্য যদি কিছু করতে পারতাম। এঁদের কথা খুব কম লোকই চিন্তা করেন, বিশেষ করে প্রত্যন্ত এলাকার লোকজনদের কথা।

প্রায় তিন বছর আগে যখন দীপেশদার সাথে আলাপ হল তখন উনি এই উদ্যোগের কথা বললেন এবং আমি সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হয়ে গেলাম যোগদান করার জন্য।

আজকে বেশ কয়েকটি অত্যন্ত মানবিক সমাজকল্যাণ মুলক কাজের সাথে নিজেকে জড়াতে পেরে খুবই তৃপ্তি অনুভব করছি।

শিশু কন্যার বোনম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্টেশান, দুঃস্থদের মধ্যে কম্বল, জামাকাপড় প্রদান, মালদার বন্যায় দরিদ্রদের চাল, ডাল বিলি করা, গ্রামীন মহিলাদের সানিটারী ন্যাপকিন প্রদান ইত্যাদি কাজে আমাদের সদস্যদের যে আন্তরিকতা ও সাহস দেখিয়েছেন এবং পরিশ্রম করেছেন তার কোন তুলনা হয় না। আর কোন এন জি ও এই রকম ভাবে কাজ করে বলে আমি জানি না। সবসময় কলকাতায় না থাকতে পারা এবং হাঁটাচলার একটু অসুবিধার জন্য আমি এখনও পর্যন্ত কোন অনুষ্ঠানে থাকতে পারিনি তবুও দারুণ আনন্দ এবং গর্ব অনুভব করেছি।

বাঁশদ্রোনী হৃদি এইভাবেই দরিদ্র এবং পিছিয়ে থাকা মানুষের পাশে দাঁড়াবে সবসময়।

নতুন স্বপ্নের আশ্বাস

ভাস্কর রায় চৌধুরী

চারিদিকে যখন বন্যায় ভ্রুকুটি ছোট্ট প্রয়াস নিয়ে এগিয়ে এল একদল নতুন প্রজন্মের

মানুষ, যারা স্বপ্ন দেখেছিল মানুষের পাশে থাকবে, মানুষের দুঃখ মানুষের প্রয়োজন।

চুড়ান্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে আশা জাগাল মানুষের বুকে আবার উঠে দাঁড়ানোর,

আবার নতুন করে বাঁচার। সর্বহারাদের জন্য যে অঙ্গীকার বদ্ধ তারা, এক নতুন

স্বপ্নের আশ্বাস — এই আমাদের

বাঁশদ্রোনী হৃদি

এখন তো তার একটাই কাজ সঠিক তথ্য দিয়ে নিয়ে ও ভাল থাকা যায় এ সত্যটা সবার কাছে প্রতিষ্ঠা করা। তার এই লড়াইতে সবসময় খুঁজে ফেরে এমন কোন প্রিয়জন যে HIV আক্রান্ত না হয়েও ওইভাবে সত্যি সত্যি তারপাশে থাকবে, আর তাই খুঁজে বেড়ায় .... পুজো আসে পুজো যায় .... খুঁজতে খুঁজতে আজ এগারটা বছর পেরিয়ে এসেও সম্পর্কে আপাত পাগল ছেলেটা কাউকে বলতে পারে না, আসলে সে কি চায়, বলে উঠতে পারে না আসলে সে মনে প্রানে বিশ্বাস করে তার একটা এমন কাঁধ দরকার যেখানে এমন করে তার স্বপ্নটা কেউ পূরণ করবে.......... কিন্তু কোনও সম্পর্কই পূজো পর্যন্ত দানা বাঁধেনা ....

এত হিসেবনিকেশ করে তো আর সম্পর্কও হয়না, তাই অংকটাও মেলেনা। কাউকেই এভাবে পাশে না পেতে পেতে ছেলেটি কখন যেন মনে মনে বিশ্বাস করতে শুরু করে রিল আর রিয়েল লাইফ এক না। অমনকরে শুধু মাত্র ভালবাসার তাগিদে নন রিয়্যাকটিভ বা HIV নেগেটিভ মানুষের সাথে পজিটিভ মানুষের মেলবন্ধন বাস্তবিকভাবে ঘটে না, এমতাবস্থায় হঠাৎ করেই অল্প বয়সী এক সমপ্রেমিযুগল যখন তার সঙ্গে যোগাযোগ করে, তাদের মধ্যে একজন সংক্রামণের শিকার আর অপরজন চিকিৎসকের সঙ্গে আলোচনা করতে চায় - ভবিষ্যৎ জীবনের পরিকল্পনা নিয়ে। যখন জানতে পারে তারা নিজেরাই মানুষের ভুল ভাঙতে এগিয়ে আসতে চায়, নিজেদের উদাহরণ বন্ধুদের কাছে মানুষের কাছে তুলে ধরে তার পাশে থাকতে চায় তখন মনে হয় সব পাওয়া সে পেয়ে গেছে....... আর নিজেকে তার ক্লান্ত মনে হয় না .... বুঝতে পারে এ বছরের দুর্গাপুজো তাকে অনেক কিছু ফিরিয়ে দিল.............

সব চরিত্রই কাল্পনিক হয় না

সময়

স্বর্ণেন্দু কুন্ডু

হাজরা মোড়ের ক্রসিং এ গাড়িটা দাড়াতেই ছোট্ট দিপু বলে উঠলো "আর কতক্ষণ মা ? কখন ঠামির কাছে যাবো" ? সমাজসেবী মিনতি দেবী হাসতে হাসতে বলে ওঠেন "এই তে বাবু পৌছে গেছি" গাড়িটা সেবাধামের গেটে দাড়াতেই, মায়ের সাথে নেমে পরে দিপু, "ওই দ্যাখ ঠামি, আরো দুটো ঠামির সাথে বসে গল্প করছে।" দিপুর বাবা অখিলবাবু গাড়িটা দাড় করিয়ে সামনে এসে দাড়ান, বাবাকে দেখে দিপু বলে ওঠে "কি সুন্দর জায়গা বাবা, বড় হলে আমিও মাকে এখানে নিয়ে আসব।" অখিলবাবু হাত ঘড়ি তে সময়টা দেখে নেন।

HIV / AIDS ও আমাদের ভাবনা

জগদীশ জানা

১. ধান ভাঙতে শিবের গীত ঃ—

২০০৬ সালের পুজোর আগে আগে আই সি টি সি থেকে বেরিয়ে ছেলেটির মনে হল এবার কিছু করার দরকার, কারণ তখনও পর্যন্ত এই ধারণাটাই বদ্ধমূল ছিল সমাজের নিম্ন বর্গীয়, নয়তো যারা জামাকাপড় বদলানোর মত শরীর বদলান শুধুই তাদের শরীরেই HIV সংক্রমণ হয়, হাতে গোনার মত কেন, একজন মাত্র যৌনসঙ্গীও অসুরক্ষিত যৌনসংসর্গে HIV -র কারণ হতে পারে এটা স্পস্ট করে আলোচিত সে সময় খুব কমই হত। আর তাছাড়া সমকামী সম্পর্কেও যথাযথ কন্ডোম ব্যবহার নিয়ে তথ্যপ্রচার সেদিন খুব বেশি ছিলনা (আজও আছে তেমন নয়)।

আজও ছেলেটির ভাবতে মজা লাগে HIV সংক্রমণের সঠিক কারণ সম্পর্কিত সম্যক ধারণা থাকা সত্ত্বেও, সেদিন রাতে খুব কাছের মানুষটির আইসক্রিমের বাটি থেকে অভ্যাসমত নিজের এঁটো করা চামচটা দিয়ে আইসক্রিম নিতে গিয়ে বলে ওঠে আচ্ছা স্যালাইভাতে কত HIV থাকে? (যদি এ সম্পর্কেও একটা ধারণা তার ছিল)...........

২। স্মৃতি সততই ....

সেদিনটা ছিল দুর্গাঅষ্টমী, মনে পড়লে আজও বুকের ভেতরটা কেমন একটা দলা পাকিয়ে ওঠে, গলার কাছে কি যেন একটা আটকে থাকে, বাড়ির কাছের পুজোমন্ডপে সন্ধ্যাবেলায় নাকি HIV নিয়ে কিছু আলোচনা হবে, আর সেই অনুষ্ঠানে সেও অংশীদার। পর্দায় My brother Nikhil চলছে, ছেলেটি আগেও দেখেছে ছবিটা, তবুও দেখতে দেখতে আনমনা, মনে ভাবছে এমন কেন সত্যি হয়না আহা ....

তারপাশে তো তার কাছের মানুষটা নেই....... (সবাই তো আর সিনেমার নাইজেল এর মত না)......... হঠাৎ করেই নজরে পড়ে, যাকে ঘিরে স্বপ্ন দেখেছিল একদিন, যার জন্য সূর্যও নাকি পশ্চিমদিকে উঠতে পারে, সেই মানুষটা সদ্য সদ্য তাকে ছেড়ে নতুন করে যার হাত ধরতে শুরু করেছে, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় মগ্ন। একরাশ অভিমান আর যন্ত্রনায় কুঁকড়ে যায় ছেলেটি। হঠাৎ করে মাইকে বেজে ওঠে তার নাম, তার সেই কাছের মানুষটি বলে ওঠে আমাদের নিখিলও আমাদের মধ্যে আজ রয়েছে, তাকে কিছু বলার জন্য মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি .... হতবাক, অভিঘাতটা সামলে উঠলেও দর্শকাসনে লোকজন বিষয়টা মেলাতে না পেরে তাকেই জানতে চায় তাকে কেন এভাবে নিখিলের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হল .... স্বভাবপ্রত্যয়ী ছেলেটি জনসমক্ষে স্বীকার করতে বাধ্য হয় সে সমকামী ও HIV আক্রান্ত...........

আবার আসিব

ঝুমা মল্লিক

ভালো থেকো মা।
তোমার খোকন এবারের ছুটিতে আর ফিরবে না।
তোমাকে কাশ্মীরা শাল উপহার দেব বলেছিলাম।
তা আর হবেনা, আমি তিনরঙা চাদরে জড়িয়ে আছি। আমার কপালে শীত ঘুম।
আমার খুব গর্ব হচ্ছে মা । ভীষণ গর্ব।
মা আমি পেরেছি দেখো, ভারত মায়ের জন্য প্রাণ দিয়েছি সহজেই। আমার আর কোন কষ্ট হচ্ছে না।
কত কত রক্তাক্ত শরীরের ভিড়ে
মিশে গেছে আমার রক্ত।
তোমরা কী চিনবে ? কোন কোন ধর্মের রক্ত নদী বইছে ? এ তল্লাশি কি করবে ?
মা দেখো, কফিন বন্দী শরীরের মিছিলে আমি,
তোমার কষ্ট হচ্ছে মা ? কাদঁবে না মা।
তোমাদের কাঁদতে নেই। আমি ভালো আছি।
তুমি ভালো থেকো মা। আর ও শক্তিশালী মায়ের জন্ম হোক। স্মৃতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করো মা।
ভারতমাতার জয়। তোমার জয়। আমি জয়ী।

ফিরিয়ে দেওয়া

স্বর্ণেন্দু কুন্ডু

-শুনুন সুবীরবাবু ইমিডিয়েট চেকটা রেডি করুন আজই "দিশারীর" নামে। কথাগুলো প্রায় ঝড়ের বেগে বলে গেলো সৌম্য চ্যাটার্জী, স্বনামধন্য ব্যবসায়ী।

কিছুটা শান্ত হয়েই সুবীরবাবু বলেন,

-স্যার একটা কথা জিগ্যেস করবো ?

- বলো।

-কি আছে দিশারী অনাথ আশ্রমে ? প্রত্যেক বছর আপনি ঠিক এই সময় চেক পাঠান ?

একমুখ হাসি নিয়ে সৌম্য,

- আমার "আমি"।

গল্প ঃ এক ঝাঁক টিয়া

মধুরিমা চক্রবর্তী

প্রথম দুটি সন্তানের জন্মের দীর্ঘ বছর পরে এল তৃতীয় সন্তান। কিছুটা অবাঞ্ছিত। কিছুটা কেনা একেবারেই অবাঞ্জিত। প্রথমটি পুত্র। তারপর কন্যা। তারা বড়ে হয়েছে। ষোলো বছরের ছেলে এখনই দেখায় যেন বিশ বছরের। মেয়েটি চৌদ্দোয় পড়ল। তৃতীয়টিও অনাহুত সন্তান। না, মেয়ে বলে নয়। বরং কন্যাভ্রূণ-হত্যা বা শিশুকন্যা হত্যার কথা শুনে শিউরে ওঠে অনিলা ও হরলাল। তাদের টানাটানির সংসারে ভাগ বসাতে এসেছে মেয়েটি। তাই বিরক্তি যায় না। তবুও সন্তান। ফেলে তো দেওয়া যায় না। অনেকেই অবশ্য ফেলে দেয়। কারুর বাড়ির রোয়াকে, রাস্তার পাশে চাদরে মুড়ে কিম্বা হাসপাতালেই। এ সবই জানে অনিলা। কিন্তু অনিলা তাদের মতো নয়। তার হৃদয় আছে, মানবিকতা আছে। সে পারবে না এ সব, মরে গেলেও না।

তারা মেয়ের নাম রেখেছে টিয়া। মেয়ে যতই বড়ো হয় একটু একটু করে, ততই অনিলার মুখ শুকিয়ে যায়। বুক টিপটিপ করে। হরলালকে বলে, "টিয়ার আড়াই বছর বয়স হতে চলল, এখনো কথা বলতে শিখল না কেন বল তো ? হ্যাঁ গো, আমাদের মেয়ে বোবা নয় তো ? হরলাল সারাদিন কাজে-কর্মে থাকে। এ সব ভয়ের কথা তার ভালো লাগে না। অস্বস্তি হয়। সে বলে, "আরে বলবে বলবে। অনেক বাচ্চাই দেরিতে কথা শেখে।" তাও চিন্তা যায় না অনিলার।

এমনি করে কাটল কয়েক মাস। তারপর দুঃসংবাদটা একদিন হঠাৎই যেন আকাশ থেকে পড়ল। তিন বছরের মেয়ে টিয়া কথা বলে না, কেমন অদ্ভুত ভাবে তাকায়। তাই আত্মীয়-স্বজনের পরামর্শে ডাক্তারের কাছে টিয়াকে নিয়ে গেল অনিলা ও হরলাল। ডাক্তার সব দেখেশুনে রায় দিলেন, "ও আসলে আর পাঁচটা বাচ্চার মতো নয়।" অনিলা নির্বাক চেয়ে থাকে। হরলাল অস্ফুটে বলে, "মানে ?" এবারে ডাক্তার বুঝিয়ে দেন, "সাধারণ লোক যাদের মানসিক প্রতিবন্ধী বলে, ভাবে স্বাভাবিক নয় ওরা, কিন্তু আমরা তা বলি না, ভাবিও না। ওরা ওদের মতো। ওটাই ওদের স্বাভাবিকতা। এ নিয়ে কোনো চিন্তা করবেন না।" আরো অনেক কথাই বললেন। ভালো করে কোনো কথাই আর কানে ঢুকল না অনিলার । ডাক্তার বলে যান, "ওর সঙ্গে আর দুই সন্তানের মতোই স্বাভাবিক আচরণ করবেন। এদের মানসিকতা বয়সের তুলনার কিছুটা অপরিণত থেকে যায়। জিভের জড়তার কারণে উচ্চারণ একটু অস্পষ্ট হয়। তবে এর ও চিকিৎসা আছে। অনেকেই এগুলো কাটিয়ে ওঠে।" ফের সতর্ক করে দেন, "আবার বলছি, ওকে স্বাভাবিক সুস্থ পরিবেশে জীবনযাপন করতে দেবেন।" আর সুস্থ। অনিলার নিজেকেই কেমন অসুস্থ মনে হচ্ছে। বিষিয়ে যাচ্ছে চারপাশ, নিজের মন।

মাঝে অনেক সময় বয়ে গেছে। সংসার পিছনে ফেলে চলে গেছে হরলাল। ছেলে হরিৎ উপযুক্ত হয়েছে, লায়েকও হয়েছে। টিয়াকে বিশেষ দেখতে পারে না । টিয়া এখন দশ বছরেরটি। চিকিৎসায় খুব একটা কাজ হয়নি। অবশ্য ভালো করে চিকিৎসাও করা হয়নি। সে এখন একটু একটু বোঝে। কথাও বলে। মন দিয়ে শুনলে বোঝা যায়। তবে দিদি টুম্পা টিয়াকে ভালোবাসে বলেই মনে হয়। চান, খাওয়া সবই তার দিদির কাছে। চলছিল এক রকম। একদিন হঠাৎ সকাল থেকেই মা -ছেলেতে কথা কাটাকাটি শুরু হল। থামল তুমুল পর্যায়ে গিয়ে। হরিৎ আজকাল প্রেম করছে। কথাটা এমন বিরাট কিছু নয়। কিন্তু অনিলার পছন্দ নয় মেয়েটিকে। কেমন যেন স্বার্থপর, অহংকারী মনে হয়। সে ছেলেকে বলে, "ওই মেয়েকে বিয়ে করলে আমি সংসারে থাকব না।" হরিৎ রগচটা বদরাগী। পাল্টা জবাব দেয়, "থাকবে না তো থেকো না। তবে টিয়াকেও নিয়ে যেও সঙ্গে। ওই অসুস্থ মেয়েকে আমি সারা জীবন দেখতে পারব না।" অনিলার কাছেও যে টিয়া চড়টা চাপড়টা খায়না তা নয়। বরং অনিলার সহ্যের সীমা দিন দিন যত ছাড়াচেছ ততই টিয়ার সহ্য ক্ষমতা বাড়ছে, মার সহ্য করার ক্ষমতা। তবু অনিলা বলে, "ও তো বোন না ? তুই বলতে পারলি এত বড়ে কথা। টিয়ার জন্য তোকে কী করতে হয় রে ? যা করার তা তো আমিই করি তো বাবার পেনশনের টাকার। ভুলেও তোর কাছে হাত পাতি না ।" হরিৎ এবার ঠান্ডা গলায় বলে, "বেশ, কালই আমি প্রিয়াকে বিয়ে করে আনব। দেখি কে আটকায়। তবে তোমার এখানে আর থাকব না।" হরিৎ তার কথা রেখেছে। সে ওই পাড়াতেই একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকে সামান্য ভাড়ায়। বাড়ি বললে ভুল হবে। একটি ঘর।

অনিলা আড়ালে চোখ মোছে। ভাবে থাক গে হরিৎ। টুম্পা তো আছে। তার অবর্তমানে ওই দেখবে টিয়াকে। যত দিন যাচ্ছে, ততই এক রকম মৃত্যুচিন্তা পেয়ে বসছে অনিলাকে। শরীরটা দিন দিন তার খারাপ হয়ে যাচ্ছে, সে বোঝে। টিয়ার দিকে তাকায় আর বুক কেঁপে ওঠে। মুখে কিছু বলে না। কিন্তু মনে মনে ভাবে, "তুই কেন এলি ? তোর জন্য আমি শান্তিতে মরতেও পারব না !" যতই চিন্তা করে ততই শরীর ভেঙে আসে। অনিলা জানে টুম্পাও প্রেম করে। ছেলেটিকে এনেছে কয়েক বার এ বাড়িতে। মায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। ছেলেটি ভালোই। টিয়াকে দেখবে - প্রতিশ্রুতি দিয়েছে অনিলাকে। শুধু তাই নয়, ঠাকুরের নামে দিব্যি করেছে। অনিলা তাই কিছুটা নিশ্চিন্ত। কিন্তু সবই মানুষের কপাল। যা হবার নয়, তা হবে কেমন করে! বিধাতাপুরুষ যে জন্মের পর কপালে লিখে দিয়ে গেছেন। তাই তো টিয়া এমন, হরলাল অকালে চলে গেল, হরিৎও ত্যাগ করল তাকে। আর টুম্পাও একদিন বলে বসল, "আমার বিয়ে দেবে না মা ?" অনিলা অবাক। কী নির্লজ্জের মতো বলছে দেখ কথাটা। মুখে বলে, "সে তো যে কোনো দিন দিলেই হয়। রাজুর বাড়িতে কী বলছে?" টুম্পা ফুঁসে ওঠে, "না

না রাজু নয়। অন্য সম্বন্ধ খোঁজ।" অনিলা আরো বিস্ময়ে বলে, "সে কী! রাজু নয়, তাহলে কে?" সতেজ বলে টুম্পা, "সে আমি কী জানি। তুমি খোঁজ । রাজুর সঙ্গে আমার কাটাকাটি হয়ে গেছে।" অনিলা রুদ্ধস্বরে বলে, "কাটাকাটি হয়ে গেছে।" আরো কিছু বলে ফেলে। যা না বললেই ভালো হত। মনের সর্বক্ষণের চিন্তা অস্ফুটে মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় নিজের অজান্তেই "টিয়ার তাহলে কী হবে ? ভালোবাসা জলাঞ্জলি দিয়ে টুম্পা ঝামড়ে ওঠে, "ওঃ! টিয়া আর টিয়া। কী তো ভারি কথা দিয়েছিল রাজু ? নিজের দাদাই দেখছে না, জামাইবাবু দেখবে? তোমার আশা তো মন্দ নয় মা?" বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় টুম্পা অনিলা ঘরের মেঝের ঠায় বসে থাকে। ওঠার শক্তিটুকুও হারিয়ে যায় তার।

মাস ছয়েকের মধ্যেই টুম্পা বিয়ে হয়ে বরের সঙ্গে দিল্লি চলে যায়। এখানে ঘরের কোণে টিয়া অনিলা দিন কাটে। হয়তো কাটতই না, সময় এগোয়, তাই কেটে যায় দিনগুলি। মন শরীরের বন্ধু, আবার শত্রুও। মনকে আনন্দে, হাসিতে মাতিয়ে রাখো, শরীর ভালো থাকবে। মন অবসন্ন, বিষাদগ্রস্ত হলেই রাজ্যের ক্লান্তি আর অসুখ এসে চেপে ধরবে শরীরকে। অনিলার মন ভারাক্রান্ত। তাই শরীরে ব্যাধির অন্ত নেই। তাতে তার চিন্তা যত বাড়ে শরীর ততই খারাপ হয়। শরীর-মনের যুদ্ধ চলতে চলতে চরম পর্যায়ে পৌঁছে একদিন থেমে গেল যুদ্ধ। চলে গেল অনিলা।

পৈতৃক বাড়ি আঁকড়ে পড়ে রইল টিয়া। ওই অবুঝ মেয়েটা সম্পূর্ণ একা। দাদার কাছে গেল না। দিদির কাছে গেল না। সে এখন আরো একটু বড়ো হয়েছে। যদিও মনটা শিশুসুলভ। ভালো করে বলতে পারে না, বোঝাতে পারে না। কিন্তু এটুকু বোঝে তাকে কেউ চায় না, কেউ ভালোবাসে না।

পাড়ার লোকের চাপে পড়ে হরিৎকে মাঝে মাঝে আসতে হয় টিয়াকে দেখতে। খাবার পাঠাতে হয় রোজ। সে উইলের ব্যাপার এখনো কিছুই জানে না। উকিলের সঙ্গে কথা বলা হয়নি। সে খালি ভাবে এই আপদ কবে বিদায় হবে। তাও হরিৎ হয়তো আসতে না। সে আসে অন্য এক অভিসন্ধি নিয়ে। যদি ঘরের কোথাও মা কোনো টাকা-পয়সা রেখে গিয়ে থাকে লুকিয়ে, তাই অনুসন্ধান করতে আসে। এমনই একদিন খুঁজতে খুঁজতে তাকের ওপর রাখা মায়ের বাজারের হিসেবের ডায়রির শেষ পাতায় একটা লেখা দেখতে পেল। মায়ের হাতের লেখা — "যে টিয়াকে দেখবে সে এই বাড়ির অধিকারী হবে।" হরিৎ ভাবল মা নিশ্চয়ই তা উইল করে গেছেন। মুহূর্তে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। উত্তেজনা চেপে রাখতে পারছে না। ভাবনা ক্রমে বিশ্বাসে পরিণত হল। তাদের পারিবারিক উকিল রামদয়াল শর্মার সঙ্গে কথা বলারও প্রয়োজন মনে করল না।

পরদিন থেকে হরিৎকে পাড়ার লোকে আর চিনতে পারে না। টিয়াকে সে অত্যন্ত যত্ন করতে লাগল। অন্য কেউ এর কারণ বুঝল না। কিন্তু এ সংবাদ যে কী করে ছড়ায় সে এক প্রাকৃতিক রহস্য। কারোর মারফৎ দিল্লিতে টুম্পাও জানল এই কথা। ক্রমে তা রাষ্ট্র হল। টুম্পা এখানে চলে এল । টিয়ার প্রতি যত্ন ও স্নেহ তারও উথলে পড়ছে।

এখন হরিৎ ও টুম্পা কেউ কাউকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। যেটুকু কথা হয়, তাও বজ্রকণ্ঠে। দৃষ্টি বিনিময় হয় আগুন ঝরিয়ে। তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে টিয়াকে যত্ন করা নিয়ে। পড়শিরা উঁকি ঝুঁকি মারে। বলে, ''যাক গে টিয়ার একটা হিল্লে হল।'' এদিকে বাড়ি দখল করে কীভাবে টিয়াকে বিদায় করা যায়, সেই ফন্দি চলতে লাগল উভয় পক্ষেই। অথচ যাকে নিয়ে এত কান্ড, সে শুধু চেয়ে দেখে। এ সব বোঝে না কিছু।

ইতিমধ্যে একদিন অফিসের কাজে হরিৎকে চলে যেতে হল ব্যাঙ্গালোর। মাস তিনেকের ধাক্কা। হরিৎ সপরিবারে গেল। ভাবল না টিয়ার কথা। তার ভয় টুম্পাকে নিয়ে। যদি সে এই সুযোগে বাড়িটা হাতিয়ে নেয়। হরিৎ চলে যাওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই টুম্পা প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাবে হাঁপিয়ে উঠল। এ যেন এক নতুন খেলা। সেও ফিরে গেল দিল্লি। আবার টিয়া একা।

তিন মাস দেখতে দেখতে শেষ হয়ে এল। টুম্পা ওদিকে দিন গুনছে হরিতের ফিরে আসার। এবার একটা রফা করতেই হবে। তাই এখানে আসার জন্য সে গুছিয়ে তৈরি। যথা সময়ে হরিৎ এল। এসেই ছুটল টিয়ার খোঁজ নিতে। আসল কথাটা সবাই জানে - টুম্পা বাড়ি দখল করেছে কিনা দেখতে। গিয়ে দেখে অবাক কান্ড। বাড়ির উঠোনে টিয়ার মতো আরো পাঁচ-ছ'টি ছেলে মেয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, হাসছে, খেলছে। টিয়ার মুখ খুশিতে ঝলমল করছে। এমন সময় এক মহিলাকে দেখে হরিৎ ব্যাপার জানতে চাইল। তার কথায় ভালো ভাবে বুঝল না কিছুই। শুধু এটুকু বুঝল, সে পরিচারিকা মাত্র। ভাবল টুম্পার কাজ। ওই মহিলাও টুম্পারই লোক। সে মিথ্যে বলছে। পরদিন টুম্পা এলে দোষারোপের পালা চলতে চলতে ধুন্ধুমার লেগে গেল।

এর দু'দিন পরে হরিৎ ও টুম্পা এক অভাবনীয় চিঠি পেল। তাদের রামদয়াল কাকা লিখেছেন। তিনি শুধু উকিল নন, তাদের পারিবারিক বন্ধুও। তাদের মায়ের অর্থকষ্টে গোপনে অনেক সাহায্য করেছেন তিনি। এখন অসুস্থ। টিয়াকে দেখতে আসার ক্ষমতা নেই। তবু তাঁর শেষ কর্তব্য তিনি করেছেন। তা-ই জানিয়েছেন চিঠিতে - ''তোমাদের বাবার আর্থিক স্বচ্ছলতা বিশেষ না থাকলেও তিনি বহু কষ্টে একটি বাড়ি তৈরি করিয়াছিলেন। বাড়িটি ছিল তোমাদের

মায়ের নামে। তিনি তাঁর মৃত্যুর আগে একটি উইল করে যান। তাতে তিনি সরকারকে বাড়িটি দান করেছেন টিয়ার মতো অনাথ ও মানসিক প্রতিবন্ধীপেদর আশ্রয়ের জন্য। জানোই তো এ সব কাজে সময় লাগে। তাই একটু দেরি হল। আর হ্যাঁ, তোমাদের সব কথা আমি শুনেছি। এবার তোমাদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ, এক ঝাঁক সবুজ টিয়ার জীবন তোমার ধুসর করে দিও না।

ইতি

তোমাদের রামদয়াল কাকা

ভালো থেকো মা

ঝুমা মল্লিক

আজ মাঘী পূর্ণিমা চাঁদের শরীর জুড়ে মায়া ছড়িয়ে পড়েছে। উঠোনে উপচে পড়ছে ফালি আলো। অন্ধকার দুরে আজও।

ভীষণ মনে পড়ছে, আজ তোমার কথা।

সবার জন্যে তোমার অক্লান্ত পরিশ্রমের দিন।

নিজের প্রয়োজন টুকু বোঝার দায় তোমার কোনদিন ছিল না।

সেই সময় গরমের দুপুরে তোমার হাতের তালপাতায় বাতাসে ছিল মায়া সুখ।

আমার সব অসুখে তোমার স্নেহ মমতাই ছিল আমার পরম ঔষধ। তারপর কত শীত এসেছে।

তুমি শিখিয়েছো খুঁটিনাটি কত জীবন সুখ।

মানিয়ে নেওয়া মানুষ হতে বলেছিলে তেমনি তো আমি।

জীবনে যে আন্দোলন প্রয়োজন ছিল বলো নি কেন মা ?

তোমার মতো ই মানিয়ে নিচ্ছি কেমন।

তুমি কেমন আছো জানিনা। আমি ? একবার ভালো থাকতে শেখো মা।

ভালো থেকো মা, ভালো থেকো।

'অন্ধজনে দেহ আলো, মৃতজনে দেহ প্রাণ'

সুরশ্রী ঘোষ সাহা

'অন্ধজনে দেহ আলো, মৃতজনে দেহ প্রাণ' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই বানী নিয়ে এগিয়ে চলেছে আমাদের পথচলা। কেউ যেন মজা করে জুড়ে দিয়েছিল অন্ধজনে দেহ আলো / গন্ধজনে সাবান। আমাদের কাজ গুলোও আমরা তেমন করে নিয়েছি দিনে দিনে। দীন হীন মানুষের কাছে সামান্য কিছু তুলে দিতে পারলেও তো অনেকখানি আনন্দ পাওয়া যায়। তবে আজকের এই লেখার কারণ আমাদের আনন্দের গল্প নয় বরং খানিক নিরানন্দের কথা বলি। বর্তমানে এন.জি.ও অনেক আছে। সমাজের জন্য কাজ করতে দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়াতে অনেক সংস্থা এসেছে। কিন্তু মানুষ এন.জি.ও কে কোন চোখে দ্যাখে আজ সেই কথাই বলব।

আমাদের কাজের অভিজ্ঞতার কথা, কি কি কাজ করেছি আমরা, সেকথা পরে অন্য কোন দিন হবে। আমার কাজ করতে গিয়ে যেসব প্রশ্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি সেই দুঃখ বলি। বর্তমানের কিছু এন.জি.ও সমাজের উপকারের নামে ব্যক্তিগত ফায়দা লাভ করে নেওয়ার জন্য বদনামের ভাগীদার হচ্ছে সততার সাথে কাজ করতে আসা বাকীরাও। আমরা জানি একটা বড় কাজ করতে গেলে অনেক গুলো সাহায্যের হাত লাগে একার পক্ষে বা কয়েকজনের মাধ্যমে তা করা ভারী হয়ে যায় অনেকখানি। আর ঠিক এই জায়গা টাতেই অনেকেই পিছিয়ে যাচ্ছে যাচ্ছে বিশ্বাস করে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে। কারন ওই, অনেক এন.জি.ও এই বিশ্বাসের জায়গাটা আগেই ভেঙে রেখেছে। আবার গন্ধ জনে সাবান দিলেও সেই সাবান কতখানি নিজেই সুগন্ধ বইছে বা স্বাস্থ্যকর দিচ্ছে সেখানেও তৈরি হচ্ছে কিছু মনে ধোঁয়াশা।

আর এখানেই আমাদের দুঃখ। আমার এক পরিচিত এক এন.জি.ও তে কাজে ঢুকেছিল সে বেশিদিন সেখানে কাজ করতে পারে না বিবেক দংশনে। সুস্থ স্বাভাবিক মানুষকে যে বনের বাঘে খায় না মনের বাঘে খায়। পথশিশুদের অন্ন বস্ত্র শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্য ওই এন.জি.ও অনেক টাকা উপার্জন করে সাহায্যে পেয়ে কাজে লাগাত না। তাদের ব্যক্তিগত আয় বিলাসিতার মাধ্যম করে তুলেছিল শুধু ওই এন.জি.ও কে। ফুটপাথের শিশুরা যে আঁধারে ছিল সেই আঁধারেই যে থাকে তাতো আমরা বাসের জানালার ধারের সিট টায় বসেও দেখতে পাই। জানি এখন আমাদের এই উদ্যোগের জন্য লড়াই অনেক, তবু যে পথ চলতে আমরা নেমেছি সেই লক্ষ্যে পৌঁছবই।

আমরা তিন বছর পূর্ণ করেছি, আমাদের দেখিয়ে দেওয়া এই পথে আমাদের প্রজন্মেরা আরো হাজার তিন বছর হাঁটবে এই শপথ নিয়েই আমরা এগিয়ে যাব। আশা করব আগামী দিনে আমাদের কাজ মানুষের কাছে আরো সম্মান অর্জন করতে পারবে। যাদের জন্য আমাদের এই উদ্যোগ তাদের সমস্যা গুলো যে বড়লোকের সমস্যার মত শৌখিন আর ফিনফিনে নয়। অনেক বেশি কঠিন তাদের জীবন যাপন। না হয় আমাদের চারহাত তাদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে খানিক ভালোবাসাই পেলাম। আমরা তো সকলেই জানি 'Love begins in shadow and ends in light'.

অনুগল্প ঃ শাসনতন্ত্র

মধুরিমা চক্রবর্তী

মনটা ভার হয়ে গেছে মানিনীর। মেজাজ খিঁচড়ে গেছে। অফিসের বস্ খুব কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছেন আজ। অধস্তন কর্মচারীদের কী মনে করেন কে জানে ! মিটিংয়ের মাঝখানে মোবাইলটা একবার বেজে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ভ্রুকুটি করে বস বললেন, "এত ব্যস্ততা কীসের? এখন অফিস আওয়ার্স। অফিস আপনাকে বেতন দেয়। সুতরাং অফিসের কাজে মন দিন।" অতগুলো লোকের সামনে লজ্জায় অপমানে এতটুকু হয়ে গিয়েছিল মানিনী। বাড়িতে ফিরেও যে একটু স্বস্তি পাবে তার জো আছে ! কাজের মেয়ে মালতী আজ আসেনি। রাত আটটা বাজে। আজ আর আসবে না। নাও ! এখন রাতের জন্য রুটি বানাও বসে বসে। কম হ্যাপার কাজ ! মানিনী একাই থাকে। তবু তিন-চারটে রুটি বানানো, তরকারি করা আর পোষায় না বাপু। কাল আসুক মালতী। আচ্ছা করে কড়া কথা শুনিয়ে দেবে সে। মাসে দেড় হাজার টাকা মাইনে দেয়। এত কামাই সে সহ্য করবে না।

পরের দিন সকালেও মালতীর দেখা নেই। এল সেই সন্ধেবেলা, মানিনী অফিস থেকে ফেরার পর। মালতীকে দেখেই মানিনী ঝাঁঝিয়ে উঠল, "ব্যাপারটা কী তোর ? কাজ করতে না পারিস তো বলে দে। অন্য লোক রাখব। সব কাজই যদি করে নিতে হয় তাহলে তোকে মাইনে দিচ্ছি কেন ? মুখ দেখে ? মালতী এ বাড়িতে পাঁচ বছর কাজ করছে। একটু ব্যথা পেয়ে বলল, "এমন করে বলছ কেন গো দিদি ? কটা দিনই বা কামাই করি!" এই বলে মালতী তার না আসার কারণ সাতকাহন করে ব্যাখ্যা করতে বসল।

মালতীর পুত্রবধূর এখনো শ্বশুরবাড়িতে ভালো করে মন বসেনি। বাপের বাড়ি যাওয়ার জন্য খালি ছটফট করে। ঘরের একটা কাজে মন নেই। সেইজন্যই তো মালতীকে মাঝে মাঝে গৃহবন্দি হয়ে পড়তে হয়। আগে তে এই-ই ছিল। এখন ছেলের বিয়ে দিয়েও সুখ নেই। ছেলেও হয়েছে তেমনি। কাজে-কর্মে নেই। মায়ের ওপর নির্ভরতা। ঘরে বসে শুধু আলস্য। মালতী একগাল হেসে বলল, "কাল বৌমাকে কড়া করে বলে দিয়েছি, আজই শেষ বার। এর মধ্যে আর বাপের বাড়ির নাম করবে না। গতরে খেটে খাওয়াচ্ছি, পরাচ্ছি। ঘরের কাজ আর করতে পারব না বাছা। যা বলব, শুনতে হবে। না হলে দূর করে দেব।"

সমাপতন

জগদীশ জানা

টিভিতে সেদিন একটা নাচের রিয়ালিটি শো দেখতে দেখতে আনমনা হয়ে গেল ছেলেটা। ছেলেবেলা থেকেই তারও স্বপ্ন ছিল নৃত্যশিল্পী হওয়ার। টাইম মেশিনের মত এক লহমায় চলে গেল বছর তিরিশ আগে। কতগুলো বছর হয়ে গেল অথচ চোখ বুজলেই মনে হয় এই তো সেদিন। সেইসময় চারপাশে এত রিয়ালিটি শো এর ছড়াছড়ি ছিল না..... ওর বাবা মনে করতেন এই সমাজে শিল্পীর কোনও দাম নেই, আর তার ওপরে ছেলেরা আবার নাচবে কি। তাই বাবাকে লুকিয়ে চুরিয়েই মনের আনন্দে পা মিলত সুরের ছন্দে। স্কুলের পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে, প্রথম যেদিন স্টেজে উঠল সেদিন অনুষ্ঠান সূচীতে দেখেও, ওর মা বিশ্বাস করতে পারেননি। ওটা ওরই নাম। প্রথাগত নৃত্যশিক্ষা না পেয়েও এমন ভাল পারফরমেন্স, স্কুলের কেউই আশা করেনি। তারপরের বছরগুলো স্কুলের বার মাসের তেরপার্বণে ওর নাচের অনুষ্ঠান আবশ্যিক হয়ে দাঁড়াল। পড়াশোনার পাশাপাশি নাচটাই ওকে বিশেষ পরিচিত করে তুলল সারা স্কুলে... কোনও একদিন স্কুলের প্রার্থনাসভার পরের অনুষ্ঠানে ভারতীয় নৃত্যের ইতিহাস নিয়ে বলতে বলা হল ছেলেটি অনুভব করল তার প্রথাগত ও ব্যাকরণগত শিক্ষা জরুরি, কিন্তু বাবাকে লুকিয়ে প্রথাগত নৃত্যশিক্ষা চালানো তার পক্ষে সেদিন ছিল অসম্ভব। অর্থ এবং সময় দুটোই বাড়িতে লুকানো ও যোগানো মুশকিল। স্কুলের সহৃদয় মাস্টারমশায় রাও পরামর্শ দিলেন নাচ শেখায়। এরকম একদিন অনুষ্ঠান শেষে আসান হয়ে এগিয়ে এল একজন, আলাপ হল যে মানুষটির সাথে তিনি নিজে পেশায় একজন নৃত্য শিক্ষক। সব জেনে নাচ শেখাতে রাজী হলে তিনি কোনও সাম্মানিক ছাড়াই। ছেলেটি যেন আকাশের চাঁদ পেল। খুশিতে ডগমগ হয়ে গেল সে। শুরু হল নাচ শেখা, কিছুদিন বাদেই মুখোশ ছেড়ে বেড়িয়ে এল মুখ, নাচের ক্লাস শেষে আচমকা একদিন শরীর দিয়ে চোকাতে হল, গুরুদক্ষিণা.....

......তারপর থেকে আর কোনদিন পায়ে ঘুঙুর ছোঁয়াতে পারেনি ছেলেটা...........

ভ্রমণ -- পাহাড়ি গ্রামে ট্রেকিং

সুবশ্রী ঘোষ সাহা

এবারে শীতে ঘুরতে গিয়েছিলাম পাহাড়ে, তবে গাড়ি চড়ে ঘোরা নয়। পায়ে হেঁটে কষ্ট করে সেই দেখা। প্রস্তুতি ছিল না কিছু। ছিল বলতে মনের আর হাঁটুর জোর। আর দমের জোর ছিল বটে আমাদের চেয়েও অনেক বেশি আমার ছোট ছেলের। প্রথমে বলি টিম্বুড়ে ট্রেকিং এর গল্প। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে গাড়ি তে শ্রীখোলা অব্দি গিয়ে তবে পায়ে হেঁটে যেতে হয় টিম্বুড়ে। পোর্টার কে রুকস্যাক দিয়ে কিছু ব্যাগ নিজেরা নিয়ে ট্রেকিং, নির্জন পাহাড়ের কোল ঘেঁষে পায়ে চলা পথ, কখনো চরাই , কখনো উতরাই, কোথাও ধস নেমে রাস্তার অবস্থা করুন ,কোথাও বা রাস্তা তৈরির কাজ চলছে।

সমতলে হাঁটা আর পাহাড়ে হাঁটা কখনোই এক নয় তা প্রথম বার ট্রেকিং-এ এসেই বুঝতে পারলাম। খানিক হেঁটে একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার হাঁটা। সাথে গ্লুকনডি দেওয়া জল খাওয়া হল বারবার। সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়ে মাথার উপর সূর্য গনগনে তাপ দিতেই ছেড়ে ফেলতে হল শীত পোশাক গুলো। হাঁটার সাথে সাথে দাঁড়িয়ে পরে দেখতে থাকলাম প্রকৃতি কে। উঁচু উঁচু পাহাড় আকাশ গাছ গাছালি যেন রূপের সম্ভার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ সরিয়ে নেওয়া যায় না তবু সরিয়ে নিয়ে তাকাতেই হবে পায়ের দিকে। নইলে এই প্রকৃতির কোলেই যে ছোট্ট পাথরের টুকরোর মত গড়াতে গড়াতে কোথায় হারিয়ে যাব। সংকীর্ণ নির্জন এই পথে হাঁটতে হাঁটতে প্রায় তিন ঘন্টা পর পৌঁছনো হল পাহাড়ি বন্য গ্রাম টিম্বুড়েতে, যাওয়ার সমস্ত পথ জুড়ে কি ভীষণ অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, পথ বিপদ সঙ্কুল তবু অ্যাডভেঞ্চারের আনন্দ তারই প্রতি পদে পদে।

টিম্বুড়ে পৌঁছে আমরা পেলাম কাঠের কটেজ, কাঁসার থালায় গরম ভাত, ৩ ডিগ্রি টেম্পারেচারেও গরম ঘর, পিছনে পাহাড়ি ঝর্ণার নদী হয়ে বয়ে চলার শব্দ। খাওয়া দাওয়া সেরে টুক করে গিয়ে দেখে এলাম ঝরনার এলোমেলো হাঁটা চলা। খুব মিশুকে বৌদ্ধ হিন্দু ৭টা পরিবার নিয়ে এই টিম্বুড়ে গ্রাম, তাতে একটাই হোমস্টে নাম স্বয়ম্ভু, লাকী নামের এক আঠাশ বছরের মহিলা এই লজের প্রধান। কঠিন লড়াইয়ের জীবন তাদের, চাষবাস ক'রে জীবন কাটে আর পর্যটক ভরসা, দু'বছর হল বিদ্যুৎ এসেছে এই গ্রামে কিন্তু খাড়াই দূর্গম পথে ট্রান্সপোর্ট শুধু ঘোড়া যাকে ঠিক ঘোড়া না বলে টাট্টু বলা যায়, আকারে এরা খানিক ছোট হয়। শীর্ন পাহাড়ি পথে তাদের পিঠে মাল চাপিয়ে নিয়ে তাদের মালিক বা সহিস যাতায়াত করে। শুধু পশুই নয় এই পথে কিছু নেপালী সমর্থ মানুষ হাতে পিঠে বুকে করে মাল টেনে পৌঁছে দেয় যারা মালবাহক পোর্টার বলে পরিচিত। রাতে খেতে বসে শুনলাম তাদের জীবনের কথা। কোন ডাক্তার, হাসপাতাল কিছু নেই তাহলে মানুষ অসুস্থ হলে কী করে জানতে চাইলে বললো 'অ্যায়সে রাস্তো

সে প্যায়দাল লে যাতে হ্যায়, বহত দূর যাতে যাতে যিসকি কিসমত আচ্ছে হোতে হ্যায় উও বাঁচ যাতে হ্যায় যিসকা ন্যাহি উও ....'

পরের দিন ঘুম ভাঙল টিম্বুড়ে তে, নতুন ভোরে নতুন জায়গায় নতুন উদ্যমে বেরিয়ে পড়লাম থাওয়া দাওয়া সেরে,লাকিকে বলে এলাম আমাদের ওথানে যেতে আর আমরা আবার আসলে কী আনবো জানতে চাইলে হাসি মুখে বললো 'আপকে উহা সে হামারে লিয়ে মর্চ্চা লানা'। পাহাড়ে গিয়ে এই ভেতো বাঙালির মাছ খেতে না পাওয়ার দুঃখটা উতলে উঠলো মনে। আমাদের রওনা হবার সময় হলো, ব্যাগ নিয়ে যাত্রা শুরু করলো টাট্টু, আর আমরা হেঁটে রওনা দিলাম শ্রীখোলা। খানিক দূর এগিয়ে হাঁপিয়ে দাঁড়িয়ে পরে যখন পিছন ফিরে তাকালাম দেখলাম টিম্বুড়ে গ্রাম পাহাড়ের জঙ্গলে কোথায় হারিয়ে গেছে এইটুকু সময়ের মধ্যে। টিম্বুড়ে থেকে গোরখে মোট ১৮ কিমি আমাদের যেতে হবে।

আগেরদিন শ্রীখোলা থেকে হাঁটা শুরু করে আমাদের টিম্বুড়ে পৌঁছতে সময় লেগেছিল তিন ঘন্টার বেশি অথচ পরের দিন সেই পথই ফিরলাম দেড় ঘন্টাতে। তখন যে মনের ভয় কে জয় করে ফেলেছি অনেকখানি। শোনা গেল শ্রীখোলা থেকে রাম্মাম একটাই কমান্ডার গাড়ি চলাচল করে, একজন দক্ষ রিটায়ার্ড মিলিটারি সার্ভিস ম্যান তা চালান। পা-কে বিশ্রাম দেওয়ার অভিপ্রায় শ্রীখোলা থেকে রাম্মাম অবধি তাই গাড়িতে যাব ঠিক হলো, তারপর রাম্মাম থেকে আমাদের ট্রেকিং শুরু হবে গোরখে। তবে ঠিক করে গিয়েছিলাম টিম্বুড়ে থেকেই হেঁটে গোরখে যাওয়া হবে কিন্তু ওই যে ঘোড়া দেখলে মানুষ তো খোঁড়া হয় গাড়ি দেখলে আরোই হয়। কিন্তু কষ্ট লাঘব করার বদলে চারগুন যে বেড়ে গেল গাড়িতে চাপার পরে টের পাওয়া গেল। আধ ঘন্টার জার্নি শরীরের প্রতিক'টা পার্টসকে যেন বোতলে পুরে জলে নুনে চিনিতে গুলিয়ে দিল। অতি দূর্গম সঙ্কীর্ন পথে কে যেন খেলতে খেলতে ছোট বড় পাথর ছড়িয়ে দিয়ে গেছে। আর তার উপর দিয়ে চাকার গড়িয়ে চলা কি ভীষণ কষ্টের তাতে যে চাপেনি তাকে ভাষায় বোঝানো যাবে না।

তারপর রাম্মাম থেকে শুরু হল আমাদের হাঁটা গহীন অরন্য পথে পাহাড়ের গা ঘেঁষে। একদিকে উঁচু পাহাড় আর এক দিকে গভীর খাদ। পথ একটাই তাই হারানোর ভাবনা নেই কিন্তু অন্যমনস্কতায় পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল আছে। পথ কোথাও সরু, কোথাও ধস নেমে আছে, কোথাও বা ঝরনার জলে পিচ্ছিল। কান পাতলে গাছেদের ফিসফিস কথা বলা কানে আসছে। শুধু পাইন আর পাইন।হাঁটতে হাঁটতে কুড়িয়ে নিলাম পাইন ফুল। নানা পাখির কাকলি নদীর কলতান গভীর জঙ্গলে ছড়িয়ে আছে। এক অদ্ভুত কান্ড ঘটলো, রাম্মাম থেকে একটা কুকুর সারা পথে গাইড করে দীর্ঘ চার ঘন্টা আমাদের সাথ দিল। আমরা আগু পিছু হয়ে পড়ছি সেও সমানে সকলকে আগলে নিয়ে চলেছে। এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড় ওঠা আর নামা, ছোট সেতু দিয়ে জুড়ে আছে পাহাড় গুলো। কত গুলো পাহাড় বদলে ফেলল মনে গোনা হল

না চলার খেয়ালে। বড় বড় শিকড় ছড়ানো পথেই ক্লান্ত হয়ে কখনো বসে বিশ্রাম নিয়ে নিলাম দু'এক মিনিট করে। বেশি বসার সুযোগ নেই, তখনও কতখানি পথ বাকি তার আন্দাজ নেই যে।

আমাদের সকল কষ্ট দূর হয়ে গেল সামান্দান ভ্যালী দেখে। চোখ মন জুড়িয়ে গেল প্রকৃতির অপরূপ মনোরম সৌন্দর্য্যে। পাহাড়ের মাথায় অপূর্ব সুন্দর ভ্যালী। ছোট গ্রাম যাতে পঁচিশ ঘর মানুষ বাস করে। কি যে অপূর্ব প্রকৃতির সৌন্দর্য তা ভাষায় প্রকাশ করার নয়। বিকাল চারটে তে সেখানে মাঠে শিশুরা খেলছে। জমি থেকে আলু তুলছে বাড়ির পুরুষ মহিলারা। মেঘ উড়ে বেড়াচ্ছে পাইনের মাথায় মাথায়। সেখান থেকে আরো এক কিলোমিটার গিয়ে গোরখে গ্রামে আমাদের রাতের ঠিকানা। এই গ্রামের রূপেও মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এখানে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে কি সুন্দর করে কাঠের বাড়ি গুলো সাজানো। এই পাহাড়ের ধাপ গুলো শীতে শুকনো ঘাসে ঢাকা ওটাই এপ্রিল মে-তে সবুজ রঙে রাঙিয়ে থাকে। মনে হল কোন স্বপ্নের দেশে পৌঁছে গেলাম। ছোট সেতু দিয়ে দুই পাহাড় কে জুড়ে দিয়ে চওড়া করে ঝরনা বয়ে চলেছে। জলের ধারে ধারে লাল লেজওলা হিল ফরেস্ট পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে। আমরা ইডেন হোমস্টে তে এসে উঠলাম। এখনও অব্দি যত পাহাড়ে ঘুরেছি যত গ্রামে থেকেছি আমার দেখা এই জায়গাকেই সেরা বলা যায়। এই গ্রামে ইলেকট্রিসিটি আসেনি মোবাইলের টাওয়ারও বসেনি। সন্ধ্যায় নিস্প্রভ আলো জ্বলে ইনভার্টার কিংবা জেনেরেটরে। যানবাহন বলতে শুধু ওই টাট্টুঘোড়া। শহুরে সভ্য জীবন থেকে এরা অনেক দূরে অনেক উপরে বাস করে। তাই তো এত সুন্দর। সন্ধ্যা নামতেই চারিপাশ ঘন অন্ধকারে ডুবে গেল। ঠান্ডায় কাবু হয়ে ঘরে একটু বসার উপক্রম করছি ছেলে এসে ডাকতে শুরু করলো, 'মা দেখবে চলো, তাড়াতাড়ি বাইরে চলো'। বাইরে টেনে নিয়ে গিয়ে অন্ধকারে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললো 'মা শুধু আকাশ টা দেখো'। উপরে চোখ তুলে ধরতে দেখলাম নিঝুম অন্ধকারে পরিষ্কার আকাশে তারাগুলো যেন এখানে অনেক নিচে নেমে এসে তাকিয়ে আছে জ্বলজ্বলে চোখে।

গোরখে গ্রাম টা যেন ঠিক বেসিন এর মতো। এই গ্রাম ওয়াইল্ড লাইফ স্যানচুয়ারি সিঙ্গালীলা ন্যাশনাল পার্ক এর ভিতর। পাহাড় জঙ্গল চারিদিকে উঁচু হয়ে আছে, মাঝে নিচু হয়ে আছে এই গ্রাম। তাই এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায় না। সে না যাক। এ যে নিজের রূপেই অপরূপা। আর কোন অলঙ্কারের প্রয়োজন নেই। শিলিগুড়ি থেকে ঘোড়ায় আসে এখানে চাল ডাল তেল মশলা সব, এরা নিজেরা চাষ করে ভূট্টা, মটর শুটি, আলু। জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে আনতে পারে না যেহেতু সংরক্ষিত এলাকা এটি, তাই এখানে কাঠটাও দুষ্প্রাপ্য । এখানে শয়নকক্ষ সস্তা কিন্তু খাদ্যদ্রব্য খুব দামী। ছত্রিশ ঘর মানুষ নিয়ে এই গ্রাম। খুব লাজুক শান্ত সরল এই পাহাড়ের মানুষেরা। ভাষা প্রধানত নেপালী। পর্যটক সূত্রে হিন্দী বলতে পারে শুধু বড়ো কিছু মানুষ।

পাহাড়ের সকল গ্রামে দেখেছি সংসারের প্রধান হল নারী। তারাই দেখাশোনা করে পর্যটকদের। এখানেও ব্যতিক্রম হল না। খুব ঠান্ডা ছিল এখানে, রাতে মাইনাস তিন ডিগ্রি টেম্পারেচার। বালিশ বিছানা মনে হল যেন ভিজে আছে। সকল স্থানেই শুতে যাবার আগে আমার স্বভাব, জানালার ছিটকিনি দেখে নেওয়া, সব ঠিক আছে তো ? না, দেখলাম কাঠের ঘরের যে কাঁচের জানালা রয়েছে তা ঠিক করে লাগানো যাবেনা কোনো মতেই। শহুরে মানুষ মনে তাই ভয় চোর ডাকাত দুষ্কৃতীর। সারাদিনের ক্লান্ত শরীর নিয়েও কান খাড়া করে শুয়ে রইলাম। যত রাত ঘন হল শুনলাম শুধু কুকুরের ডাক। কখন তারপর ঘুমিয়ে পড়লাম জানলাম না। পরের দিন জানলাম রাতে চিতা এসেছিল তাই কুকুর ডেকেছে সারারাত। আর এও বুঝলাম কয়েকজনা মানুষ নিয়ে এই গ্রামে চুরি ডাকাতি অসম্ভব। দূর থেকে হেঁটে আসা পর্যটকরা তাদের কাছে ভগবানের মতো। আমরা পরের দিন টাও থেকে গেলাম গোরখে তে।

অনেক আগে আমাদের পিছনে ফেলে রেখে আমাদের ব্যাগ নিয়ে চলে গেছে সহিস ও টাট্টু। শুধু পথে চিহ্ন রেখে গেছে গন্ধ ভরা পটি। আমরা তাদের হাঁটার গতির সঙ্গে কি কখনো পেরে উঠি! বড় বড় গাছের ফাঁক দিয়ে রোদের আলো যেন আরোই কমে এল। উঠতে উঠতে যখন পাহাড়ের মাথায় এসে পৌঁছলাম তখন ঠিক বিকাল চারটে। ·

গোরখে গ্রামে ঢোকা বা বেরুনো সবই পায়ে হেঁটে। পরের দিন ফিরবো বলে গোরখে থেকে পাহাড়ি পথে হাঁটা শুরু হল। পথে শুনলাম আগের দিনই এই পথে কোলকাতার দশজনের টিম ট্রেকিং করে যাবার সময় এক ব্যক্তি না হেঁটে ওই দুর্গম গিরিপথে ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছিলেন, অসুস্থ হয়ে ওখানেই খাদে পড়ে মারা যান, সেই দুশ্চিন্তায় তার সাথের গাইড মিনমা শেরপা তখনই ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। তার ঘরেও বউ ছেলে আছে তবু তার কাছে এই শোক যেন আরো বড়ো হয়ে গেল, এমনই হয় পাহাড়ের মানুষ। আমাদের মত শহুরে সভ্য শিক্ষিত মানুষরা কোনদিনই হিসাব মিলিয়ে উঠতে পারবো না। খারাপ খবর মন মুষরে দিল। ভগবান সহায় বলে হাঁটতে থাকলাম, চলতে চলতে মন ভালো করে দিলো অসময়ে ফোটা রডোডেনড্রন, নানা দিক দিয়ে বয়ে চলা ঝর্ণার শব্দ যেন নূপুর পায়ে ছন্দে ছন্দে কেউ হেঁটে চলেছে। অচেনা পাখি গাছের ডালে ডেকেই চলেছে। সিকিমের ভারেঙে আমাদের জন্য গাড়ি অপেক্ষা করছিল। ভারেং ছোট্ট গ্রাম, দুদিন সব জমজমাট জীবন থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিরিবিলিতে কাটিয়ে আসার মতো। শুধু পাহাড়ের দিকে তাকিয়েই সময় কেটে যাবে। আমাদের এবারের মত ট্রেকিং শেষ করে গাড়ি তে গিয়ে উঠে বসলাম। পাহাড়ের সঙ্গ ছাড়তে ছাড়তে মনে গান ভেসে এলো

'আমার তো গল্প বলা কাজ, নটে গাছ মুড়িয়েছে আজ

এবার ফিরি তবে পাহাড়ের ঢাল গুনে গুনে,

কাঁটা কাঁটা ঘসে ঘসে উলে উলে বুনে বুনে।

সব তো বলা যায় না মুখ ফুটে, আসলে গল্প বলে ঠোঁটই অস্ফুটে ঘুড়ির ঠিকানা জানে গাছের মাথার কাটা সুতো আমার ফেরার পথ আরো যদি মেঘে ঢেকে যেত......

নদী , সাইকেল আর কিছু অন্য কথাঃ

সম্রাট মৌলিক

পথ গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যাচ্ছে। ওকে যতই ধরে, পকেটে পুরে নেবার চেষ্টা করি, ধরতে পারি না। আমার থেকে যারা বড়, তারা অনায়াসে হুহু করে বাতাসের সাথে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যায়। আমি থমকে যাই। দু পাশে, এদিক ওদিক দেখি। একটু দূরে এক মস্ত বড় দীঘি চোখে পড়ে। প্রবল হাওয়ার দেমাকে, সে সাগর হবার চেষ্টা করে। ছোট ছোট শিশু ঢেউ, তাড়াতাড়ি বড় হবার আশায় ছপ ছপ শব্দ তোলে। চড়া রোদে, এমন বাতাস, মনে আর শরীরে অকাল বৈশাখীর তৃপ্তি ছড়িয়ে দেয়। কন্যাকুমারী আর মাত্র তেরো কিলোমিটার। ইচ্ছে করে না এগিয়ে যেতে। যতক্ষণ পারি এই আমেজে বন্দি থাকতে চাই। পৌঁছে গেলেই শেষ। শেষ হয়ে যাবে প্রাণ উপুড় করা আবেগের। প্রাপ্তিতে দুঃখ বেশি। লক্ষ্যে ছুটে চলার উত্তেজনা প্রাণের স্পন্দনে ভরপুর থাকে। লক্ষ্য ফুরিয়ে গেলে, ইচ্ছের অপমৃত্যু হয়। এই তেরো কিলোমিটার কি একটু দীর্ঘয়িত করা যায় না ?

না। তা করা যায় না । জীবন মানে ক্রমাগত দিন-রাত। অনন্ত সময়ের বয়ে চলা। তাতে আগে পিছু হবার জো নেই। প্রতি সেন্টিমিটার জুড়ে জুড়ে কিলোমিটার পার করেছি। কোনো শর্টকাট পাইনি। অমোঘ এই নিয়মকে তাই মেনে নিতেই হয়। ঘোর ভেঙে মেরুদন্ড সোজা করে দু চাকায় চেপে বসি। দীঘির ওপর দ্রুত, অতি দ্রুত উড়তে থাকা অজানা পাখিটাকে আড় চোখে দেখে নিয়ে শেষ সঞ্চয়ের তেরো কিলোমিটার খরচ করতে শুরু করি।

একশো চৌদ্দ দিন ধরে জলে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-বরফে এমনকি রণাঙ্গন পার করে এসেছি কলকাতায়। বলা ভালো ফিরে এসেছি। ফিরে এসেছি পাঁচ হাজার দুশ কিলোমিটার জুড়ে অসংখ্য প্রাণের দীপ্তি নিয়ে। সাইকেল এই অতিক্রান্ত পথের সারথি মাত্র। কিন্তু গল্পের মত এই ভ্রমণের নায়ক 'মানুষ'। আমি ঋদ্ধ হয়েছি। নিজের অক্ষমতাকে নিমেষে বুঝেছি। ভুল ধারণা ভেঙে 'মানুষ' হবার উত্তরণে আরো এক ধাপ এগিয়েছি।

শুরু করেছিলাম জম্মু-কাশ্মীরের লেহ শহর থেকে। সেই অর্থে ভারতবর্ষের উত্তরতম শহর থেকে। বরফ শীতল পাহাড়ি উপত্যকা, তাকে ঘিরে রাখা বরফে ঢাকা বরফে উত্তুঙ্গ পর্বত শিখর ভয় করতে শিখিয়েছে। ভয় থেকে শ্রদ্ধা জন্ম নেয়। প্রতিবারের মত, এবারও মাথা ঝুঁকিয়ে, হাত জোড় করে প্রণতি জানিয়েছি। আপাত নিশ্চুপ, নিশ্চল পাথরের স্তুপকে শিব জ্ঞানে পূজা করেছি। এই পূজায় কোন মন্ত্র বা পুষ্পার্ঘ্য ছিল না। শুধু অঙ্গীকার ছিল। অঙ্গীকার ছিল, এই মহান সৃষ্টির কাছে, অভিযানের শেষ দিন পর্যন্ত মা প্রকৃতির বাধ্য সন্তান হয়ে থাকবার। আমি নিষ্ঠার সাথে পালন করেছি। তার বিনিময়ে অনায়াসে হাত ধরে ঘুরিয়ে এনেছেন সেই সর্ব শক্তিমান।

সল্প পরিসরে সব কিছু ভাগ করে নেওয়া অসম্ভব। তাই এই অভিযানের মূল বিষয় বস্তু একটু ভাগ করে নিই। আমার এবারের লক্ষ্য ছিল ভারতের একশো তেরোটি নদী দেখা। নদীদের হাল হকিকত জেনে তাকে বইয়ের আকারে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া। সদ্য ফিরেছি। এখনও কাটাছেঁড়া শুরু করিনি। তাই মোটের ওপর একটা ধারনা দিতে পারি মাত্র।

সহজভাবে বলতে গেলে, ভারতবর্ষের উত্তরের নদীগুলো মূলত হিমবাহ থেকে পুষ্টি লাভ করে আর দক্ষিণের নদীগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৃষ্টি নির্ভর। আমি অচেনা কাশ্মীরের অন্য ভয়াবহতার কথা শোনাই। কাশ্মীর ঘাঁটির উল্লেখযোগ্য নদী ঝিলাম। যদি তার করুণ অবস্থা দেখতে চান, তবে ট্যুরিস্ট নয় একজন ভারতীয় হিসেবে কাশ্মীরের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলো ঘুরে দেখুন। শিউরে ওঠার মত পরিস্থিতি। এখানে নদীর ওপর সন্ত্রাস আমরা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে চালিয়েছে। অসহায় ঝিলাম শুধু বোবা হয়ে আজও বয়ে চলেছে। দিনে দুপুরে নদীও চুরি হয়। ঝিলামের দু-পাশে অসংখ্য বেআইনি নির্মাণ কাজ হয়েছে। বাড়ি-ঘর তৈরি হয়েছে। তার ফল স্বরূপ কাশ্মীর ২০১৪ এবং ১৫ সালে ভয়াবহ বন্যার মুখোমুখি হয়েছে। অবস্থা এত বছর পর যে বদলেছে এমনটা নয়। শ্রীনগর, অনন্তনাগ, পুলওয়ামা এবং বারামুল্লা জেলার অধিকাংশ গৃহস্থ বাড়ি ও হোটেলের আবর্জনা সরাসরি এসে মিশে যায় নদীতে। 'রোশনি অ্যাক্ট' প্রণয়নের পরে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। এই পরিস্থিতি থেকে ঝিলামের আদৌ মুক্তি হবে কি না, হলেও কবে হবে তার উত্তর শুধু সময় দিতে পারবে।

এই একখানি মৃতপ্রায় নদীর বর্ণনা শুনে যদি ঘাবড়ে গিয়ে থাকেন, তাহলে ভাবুন বাকি একশ বারো নদীর শ্রাদ্ধবাসরে কি ভাবে হাজির হবেন।

মন্দের পাশে ভালোর আখ্যান থাকা উচিত। তুলনাহীন সব কিছুই আমরা ভুলে যাই। তাই মান্ডবিকে মনে পড়ে। পানাজি পৌঁছে প্রথম মান্ডবি নদীকে দেখি। বিশাল কায়া, নীলাম্বরী সাগরে মিশে যাবে বলে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। প্রথম দেখাতেই ভালো লাগা। কিন্তু এই ভালো লাগা ভালোবাসতে পরিবর্তিত হল যখন পথ ভুলে একদিন ময়না ফেরি ঘাটের সামনে এসে দাঁড়ালাম। মান্ডবি এখানেও যৌবনবতী। প্রগাঢ় নীল ধারাতে আগন্তুককে পাগল করে তোলে। কেউ কোথাও নেই। দু পাশে গাছের ছায়া নদীর জলে আলিম্পনা আঁকে। মনে হয়, যুগ যুগ ধরে, এই ছবি এভাবেই ফ্রেমে বাঁধা আছে। কিছু জেলে নৌকা রাজসিক কায়দায় জল বিহার করে। কথা বলি তাদের সাথে। কি স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের আর আত্মবিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ। নদী যদি প্রেয়সী হয়, তবে তারা শ্যাম মুরারী। এই অম্লান ভালোবাসা নদী ও মানুষ, দুজনের চওড়া

হাসিতে বিজ্ঞাপিত। এবার মন খানিক থিতু হয়। সত্যি সবটাই খারাপ নয়। কিছু ভালো বুকে আগলে ঘরে ফিরতে পারবো।

আমার এই অভিমান আসলে কিছু মাস আগে গঙ্গা-পদ্মা ধরে যে তিন হাজার কিলোমিটার সাইকেল ছুটিয়েছিলাম তার এক্সটেনশন মাত্র। এই অভিযান হয়ত সময়ের দাবি মেনে কন্যাকুমারীতে থেমেছে। তবে খুব তাড়াতাড়ি এর তৃতীয় পর্যায় শুরু হবে। আমি নিজেকে গুছিয়ে নেবার জন্যই কলকাতায় ফিরে এসেছি। পথ আমার ঘর, নদীর আমার খোলা উপন্যাস। যতদিন শারীকি ও মানসিক সক্ষমতা থাকবে, থামবো না। আমার অঙ্গীকার রইলো, আগামীর প্রতি।

বাংলা ভাষা

ঝুমা মল্লিক

আজও রক্তের দাগ দেখা যায় ওই পথের নুড়ি পাথরে ।
মানুষের ভিড়ে বাংলা ভাষার জয়গান ওই দুরে।
শুধু কি আন্দোলন ছিল? নাকি প্রানপণে ভালোবাসা।
ও আমার "বাংলা ভাষা" আমি তোমায় ভালোবাসি।
দীর্ঘজীবি হোক বাংলা ভাষা।
কবির দেওয়াল জুড়ে, তুমি বেঁচে থেকো বাংলাভাষা।
নবজাতকের মুখে প্রথম উচ্চারিত শব্দ হোক বাংলাভাষা।
মেঠো পথের গান হোক বাংলা ভাষায়।
পুরনো বটের পাঁজরে লেখা আছে যে নাম
সে তো বাংলা ভাষায়।
শহর জুড়ে এত যে আন্দোলন, তা তো বাংলা ভাষায়।
রাজনীতির নেতারা ভাষণ দেন আজও বাংলা ভাষায়।
নতুন প্রেমের আজও জন্ম হয় বাংলা ভাষায়।
ভালোবাসি, ভালোবাসি বাংলা ভাষা।
তোমার জন্য ই বাঁচিয়ে রাখবো লাল পলাশের দল।

'বাঁশদ্রোণী হৃদি

সম্রাট মৌলিক

বাঁশদ্রোনী হৃদির জন্মদিন অর্থাৎ পুণ্য লগ্ন। গত তিন বছরেই সে বয়সের তুলনার একটু বেশিই সাবালক। হবেই বা না কেন ? এই সংগঠন যাদের হাত ধরে আগামীর সম্ভাবনার কথা লিখছে, তারা 'মানুষ', সমাজ, 'দায়িত্ব' শব্দের নতুন অর্থ আমাদের সবাইকে শিখিয়েছে। সাধ্যের মধ্যে থেকেই কত অসাধ্য সাধন করা যায়। আমি দূর থেকে হলেও সাক্ষী থেকেছি। তাই অন্তরের শুদ্ধতম ভালোবাসা ও সম্মান জানাতে চাই।

এই পথ চলা যেন আকাশের মতই সীমাহীন হয়। আমি নিশ্চিত,

এই পথ শেষ হলে আরেক পথের সন্ধান দেবে 'বাঁশদ্রোনী হৃদি'।

EMOTION

Ayan Ghosal

Tears! I know not what it means
It comes out of despair uncontrolled unhinged,
It rises in the heart and comes out through eyes;
Look at the last golden ray of Sun
The day is gone by; it'll be no more;

The little child with trembling feet
Was adorable for all her deeds;
Twisting and twinkling in the lap of grand parents
Endless joy which will never end;

The Sun is above and full glow
The child is like a blooming rose;
The Sun is now set, found her grand mom dead;
The shock, she can never forget
Tears rolls down her chick unnoticed;

The little plant now a full grown tree
Bearing fruit and shadow for many;
Her leaves are green very green
Lustrous beauty never explained;

Winter came leaves looming golden
Loosening the twig falling gently on the field
Beauty has gone, barren tree does not attract anymore;
Her only brother left her at the age of thirteen
She looks despair lost her beloved one;

Sitting on a coach she fined herself alone
Ah, sad and strong as dark summer dawn,
Hearing the music of half awakened bird
To dying ears, unto dying eyes;

A sudden jerk kept her alert
A sweet voice of autumn bird;

A beautiful hallo all around
No darkness, no pain, all over;
A sweet harmony playing on her mind;
She found Indrakshi, her little girl calling her
She took her on her lap, kissed her brow
Cries posthumously for relive and retrieve;

HRIDHI- Synonym for Benevolence

Moushumi Kundu

HRIDHI, which in bengali means directly from the heart, is an organisation where we believe, it's not enough to be compassionate, but we need to act so as to bring about the change we aspire to see in this world. HRIDHI is about being wise and humble to be able to provide services to the needy, to the best of our ability. HRIDHI is another name for the opportunity we get, to provide unconditional love and care to the uncared souls and thus pay the rent of living in this wonderful place called the Earth. HRIDHI believes, "To serve is beautiful, but only if it's done with Joy, a Whole heart and a Free mind." HRIDHI is about inspiring those young minds who someday with rise and will look at it to say," Because of you I didn't give up." HRIDHI is about frustrations, challenges, difficulties, differences, which end up with resounding triumph, love, courage, edurance and joy of winning. HRIDHI is about giving Hb the winning cry and making interdependence synonymous to Oldphanage

সহযোগ

সুমন ঘোষ

তৃতীয় সন্তান। আবার মেয়ে............ কমলার উপর অত্যাচারটা বেড়ে গেল বাড়িতে। অত্যাচার অবশ্য আগেও হতো, প্রথম দুই সন্তান ও যে মেয়ে। সবার খুব আশা ছিল, এবার অন্তত দেবী দুর্গা মুখ তুলে চাইবেন। দেবী হয়তো মুখ তুলে চেয়েছিলেন ও, আর তাই তার অংশই এসেছে কমলার কোলে।

নৃপতি, মানে কমলার স্বামী, এবারও মেয়ে হওয়াতে কষ্টই পেয়েছিল, তাই কমলার উপর অত্যাচারের ব্যাপারে বাধা দেয়নি। শাশুড়ি স্পষ্ট হুকুম জারি করলেন, এই মেয়েকে হয় বাড়ি থেকে সরিয়ে দিতে হবে, না হলে কমলাকে এই মেয়েকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।

কোথায় যাবে কমলা? তার এখন তিন কূল এ কেউ নেই। অগত্যা একদিন রাতে নৃপতি দুটো গ্রাম পরে তেরো দিন এর মেয়েটাকে নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে আসলো। কমলা অনেক কাঁদলো, কিন্তু অসহায় মা এর কান্নার কোনো দাম দিলো না কেউ।

সত্যিই মেয়েটা বোধহয় দেবীরই অংশ! ওই ভরা নদীতে ভাসতে ভাসতে দু-তিনটে গ্রাম পেরিয়ে গেলো, কিন্তু প্রাণবায়ুটা বেরোলো না! গরিব গ্রাম এর বুড়ো ভিখারি কাঞ্জন, সকালে নদীতে এসেছিল জল খেতে। কান্নার আওয়াজ শুনে দেখতে পেলো মেয়েটাকে, কি মনে হল তুলেও নিল কোলে। নিয়ে গেলো তার রাজপ্রাসাদে, মানে গ্রাম এর পরিত্যক্ত মন্দিরে। ভিক্ষা করে এনে দুধ খাওয়াল, খড়ের বিছানা করে মেয়েটাকে শোয়াল, একটা কাঁথা ও আনল ভিক্ষা করে! আর হ্যাঁ একটা নামও রাখলো, দূর্গা কি অদ্ভুত ! তাই না ?

দুর্গা কে নিয়েই সে ভিক্ষা করতে বেরল। কিন্তু গ্রামবাসীদের কৌতুহলও আর ভিক্ষা করা যাচ্ছিল না। সবাই ভাবছিল কাঞ্চন মেয়েটাকে চুরি করে এনেছে। অগত্যা সে গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে গেল। অনেক পথ হেঁটে পৌঁছে গেল দূরের একটা গ্রামে। যেখানে কেউ তাকে চেনে না......... এই গ্রামে সবাইকে সে বললো দুর্গা তার মা - বাবা হারানো নাতনি। কিন্তু পেশাটা একই থাকল। এই বয়সে আর কি কাজই বা সে করবে ! এ গ্রামে, সে গ্রামে ভিক্ষা করে চলতে লাগলো তাদের। এই বয়সে আর কি কাজই বা সে করবে ! এ গ্রামে, সে গ্রামে ভিক্ষা করে চলতে লাগলো তাদের। ছোটো নাতনির জন্য ভিক্ষাটা একটু বেশিই পেত লাগল। তাতে দুবেলা খাবারটা জুটে যেতে লাগল। দেখতে দেখতে বারোটা বছর কেটে গেল। কাঞ্চন এর এখন বয়স প্রায় চুয়াত্তর ! দুর্গা বার বছরের কিশোরী। কাঞ্চন এখন আর ভিক্ষা করতে বেরোতে পারে না। গ্রামের লোকেরাই এই দাদু-নাতনিকে একটা পরিত্যক্ত কুঁড়ে ঘর এর থাকতে দিয়েছিলো। দুর্গাকে পড়াশুনা করাতে পারেনি কাঞ্চন। সেই সামর্থ্য তার হয়ে ওঠেনি। দুর্গা

এখন দশভুজা হয়ে গ্রাম এর জমিদার বাড়িতে কাজ করে। জমিদারি নেই, কিন্তু রক্তটা রয়ে গেছে ! তাই কাজে খুশি হলেই মেলে ''পুরস্কার''। বিকেলে বাড়ি ফিরে সে তার দাদুর সেবা করে, পা টিপে দেয়, দাদুকে খেতে দেয়, সকালে দাদুর স্নান এর জল তুলে দেয়, পুরস্কারের টাকা থেকে ফল কিনে দেয়, তারপর দাদুর সকালের খাবার করে রেখে কাজে চলে যায়। আবার ফিরে আসে বিকেলে ।

সংসার থেকে বিতাড়িত হয়েও, সে পেয়েছিল তার ''দাদু''কে, আর কাঞ্চন? সংসার না করেও পেয়েছে তার ''নাতনি''। পরে কি হবে ? জানি না। এই বিশ্বসংসারে, আজ তারাও সংসারী ....

সবার হয়তো কাঞ্চন বা দুর্গার মত সহযোগ হয় না ! কিন্তু এই পৃথিবীতে এরকম অনেক ''কাঞ্চন'', অনেক ''দুর্গা'' আছে। তাই আমরা সবাই এগিয়ে এসে, যদি তাদের মধ্যে একটা সহযোগ ঘটিয়ে দিতে পারি......... আসুন না।

ছেলেটির মেয়েবেলা

জগদীশ জানা

ও ছেলে তুই কেমন আছিস ?
এখনও কি স্বপ্ন দেখিস।
যেমন ছিলি ছেলেবেলায়..........
ছেলেবেলা নাকি মেয়েবেলা-
গামছা দিয়ে তো চুল বাঁধতিস।

ও ছেলে তুই কেমন আছিস ?
মায়ের শাড়ি, পুতুলখেলা,
রান্নাবাটি, ফুলের মালা
এখনও কি স্বপ্ন দেখিস!
ছেলে হয়েও মেয়ের সাজ!
কি বলত গোটা সমাজ-
মেয়েমুখো, মেয়েন্যাকড়া
ছক্কা, বৌদি, মওগা, লেডিস.........

ও ছেলে তুই কেমন আছিস,
আজও কি তুই সে স্বপ্ন দেখিস!
রাঙা মাথায় চিরুনি
বর আসবে এখুনি-
তাহলে তুই ভুল ভেবেছিস।
বর আসবে না বউ আসবে
তাই ভেবেই তো দিন গুনিস!

ও ছেলে তুই কেমন আছিস-
এখনও কি ভয়েই মরিস!
স্কুলের বেঞ্চ, খেলার মাঠ
পেরলি না সে চৌকাঠ
ভয়ে ভয়ে শুধুই থাকিস।
সেদিন যখন ছেলের দল
খেলত, ক্রিকেট নয় ফুটবল-
ভয়ে ভয়ে তুই দূরে থাকতিস।

বুঝতো না ত কেউ তোর ব্যথা,
কোন লজ্জায় তোর কাটত মাথা
কেন যে তুই স্কুল পালাতিস ....
ও ছেলে তুই কেমনে বাঁচিস
আজও কি তুই ভয়েই থাকিস!
বলনা, বলনা রে তুই কেমন আছিস ?

ছেলে আমি ভালই আছি...........

আমার তো কোনও ভয় ছিলনা
ছিলনা তে কোনও টানাপোড়েন
খুলে গেলে মুখোশ তোমার
লজ্জা পেত 'ওসামা লাদেন'।
নিজেও তুমি দিয়েছিলে যোগ,
মেয়েলি বলেই তে করলে ভোগ!
কিন্তু তুমি যে পুরুষালি,
মারছ খোঁচা তাই আমার খালি-
(ভুলে গেছ) এক হাতে তো আর বাজেনা তালি...........

আমার ভোটটাও লাগে দরকার
ট্যাক্সটাও গুনে গুনে নেয় সরকার
শুধু দরকার মত বলে থুড়িঃ ও আব্বুলিশ।

যতই আমাকে কর ব্যাঙ্গি
যদি নাও পাল্টাও তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গি
ভালই আছি ভাল থাকবও
যাবে আসবেনা কোনও উনিশ বিশ।

কিছু আমার কথা, কিছু সবার কথা

উমা মৈত্র

দীর্ঘকালীন শিক্ষকতাসূত্রে "ক্রিশ্চান আইরিশ ব্রাদার্স" দের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। কলকাতায় ২/১টি বিস্তীর্ণ অঞ্চলের পথশিশুদের নিয়ে বেশ কিছু কাজকর্ম করতে হতো। একটা কথা বিশেষভাবে মনে হতো, ওরা যে অনেককিছু থেকে বঞ্চিত, চাইলেই সে সবকিছু পাবে না....... এই অনুভূতিটা ওদের মনে ছিল এবং সঙ্গে কুণ্ঠাও।

মাদার টেরেসরা (যিনি এখন সন্ত) 'শিশু ভবন', 'আশা শিশু নিকেতন' সব জায়গাতেই ছবিটা প্রায় একই রকম। আমরা স্কুলের বড় বড় শ্রেনীকক্ষে এনে ওদের পড়ানো, বড় মাঠে খেলার সুযোগ করে দেওয়া, ওদের জন্য এবং ওদের দিয়েই অনুষ্ঠান করানো — এইসব কাজের মধ্যে দিয়ে খানিকটা কাছাকাছি এসেছি, হাসি ফুটেছে অনেকেরই মুখে। মায়েরাও খুশী ও নিশ্চিন্ত ছিল। 'আশা শিশু নিকেতন' এর বাচ্চাদের হাতে আঁকা ছবি দিয়ে কার্ড বানিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জনকে পাঠানো হতো। এ ব্যাপারে CRY এর সঙ্গে যুক্ত ছিলাম।

বর্তমানে 'হৃদি' পরিবারভুক্ত হয়ে খুব ভালো লাগে। সীমিত সাধ্যের মধ্যে অনেক কিছু করতে ইচ্ছা করে কারণ বয়সে প্রবীণ হলেও মননে নবীন আমরা অনেকেই আছি। হয়তো আমাদের সক্রিয় ভূমিকায় থাকার মতো কোনো সুযোগ নেই, তবু স্টেজের পর্দার আড়ালেও তো অনেক কর্মীই থাকে। যেহেতু সারা রাজ্য জুড়ে আমাদের ক্রিয়াকর্ম রয়েছে, যেহেতু প্রত্যন্ত গ্রামেও আমাদের নজর আছে, আমাদের পথ কিন্তু অনেক দীর্ঘ, তাতে অনেক মাইল ফলক। একটা একটা করে সেগুলি সবাই মিলে পার হবার চেষ্টা থাকবেই। এই প্রসঙ্গেই কিছু ভাবনা মনে আনাগোনা করে। আমরা যেনো 'বাধ্যবাধকতা' আর 'আন্তরিকতা' শব্দ দুটিকে সঠিক ভাবে বর্জন ও গ্রহণ করতে পারি। পরস্পর বিরোধী শব্দ সূচীপত্রে আমরা রাখবো না। চটক এবং চমক বর্জন করে সমান্তরাল অনুভূতি নিয়ে আমরা যেন পথ চলতে পারি।

আমরা চিন্তাধারা এবং প্রকাশ সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য কিনা জানি না। এ লেখা সমালোচিত হলে আরও ভালো লাগবে কারণ আমি বিশ্বাস করি সকলের কাছেই কিছু না কিছু শেখার আছে। যাদের কথা ভেবে আমরা এগিয়ে চলেছি তাদেরকে যেন জোর দিয়ে বলতে পারি......... "আমি তোমাদেরই লোক"।

এবারের মতো শেষ কথা হলো.........
"হৃদিকে আমরা হৃদ্‌মাঝাঁরেই রাখবো"

মানুষ মানুষের জন্য

পুতুল মৈত্র

ভালো মন নিয়ে লিখতে বস মনটা ভারাক্রান্ত হলে গেলো .... মনে পড়ে গেল ১৪ই ফেব্রুয়ারী ২০১৯ .... "ভালোবাসার দিনে" "পুলওয়ামা" য় সন্ত্রাসবাদীদের হামলায় মৃত সৈনিকদের কথা, তাদের পরিবারের কথা, সারা দেশ শোকাহত, আমরাও মর্মাহত।

সন্ত্রাস হিন্দুরা করে না -
সন্ত্রাস মুসলমানরাও করে না-
সন্ত্রাস করে সন্ত্রাসবাদীরা,
তাদের কোনো ধর্ম হয় না - জাত হয় না,
তাদের একটাই পরিচয় - তারা সন্ত্রাসবাদী।
হামলা বা পাল্টা হামলা অথবা যুদ্ধ কোনোটাই সমাধানের পথ নয় -
আসলে যারা যুদ্ধে যায় তারা যুদ্ধ চায় না
আর যারা যুদ্ধ চায় তারা যুদ্ধ যায় না।
আমরা যুদ্ধ চাইনা.................

But we only support class war,
War against misery, poverty and disease.

'মানুষ মানুষের জন্য' এই লাইনটা শুনলে শুধু একটা নামই চোখের সামনে ভেসে ওঠে....... "Bansdroni Hridhi"। হৃদয় থেকেই 'হৃদির জন্ম তাই তো তার নজর সব দিকে ... দুঃস্থ ও স্বাস্থ্য। প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে সেখানকার মানুষদের জামা কাপড় দেওয়া, কম্বল বিতরন করা, বন্যার ত্রাণ নিয়ে বন্যাদুর্গতদের কাছে সঠিক সময়ে পৌঁছে যাওয়া, ক্যান্সার আক্রান্ত দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো, গরীব ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার খরচ বহন করা, সু-অভ্যাস মানুষের গড়ে তোলার জন্য পিছিয়ে পড়া মেয়েদের ও মহিলাদের মধ্যে স্যানিটারি নাপকিন বিলি করা ও তাদের স্বাস্থ্য সচেতন করে তোলার জন্য কাউন্সেলিং এসবই করেছে হৃদি। যে সব মানুষদের বাড়ির লোকজন হসপিটাল এ রোগ নিরাময়ের জন্য চিরতরে রেখে চলে গেছে তাদের পাশেও আছে হৃদি। আর যেসব শিশুরা দুরারোগ্য HIV/AIDS এ আক্রান্ত তাদের হাতে পূজোতে নতুন জামা তুলে দেওয়া .... এ এক অভিনব উদ্যোগ। রক্তদান শিবিরের আয়োজন

করে এলাকায় যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে হৃদি। গরম কালে যখন রক্তের অভাবে মুমূর্ষ রোগীরা যখন মৃতপ্রায় তখন রক্তদান শিবিরের আয়োজনের মাধ্যমে হৃদি এদের পাশে থেকেছে।

আর একটা কথা না বললেই নয় গত ১৩ই জানুয়ারি ২০১৯ বারুইপুরের বনমালী গার্ডেনে অভিনব এক পিকনিকের আয়োজন করেছিল হৃদি। বিশেষভাবে সক্ষম কিছু বাচ্চা ছেলে ও মেয়ে এবং পিছিয়ে পড়া ঘর থেকে আশা ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমরা সবাই মিলে সারাদিন হইহই করে কাটালাম। সব বয়সের জন্যেই ছিল নানা ধরণের খেলার আয়োজন। ব্যবস্থাপনা থেকে খাবার সবটাই ছিল অসাধারণ। এইদিন উপস্থিত সব বাচ্চাদের শীতবস্ত্র বিতরন করা হয়। গান কবিতা আলোচনা খেলাধূলা সব মিলিয়ে দিনটা মনের মণিকোঠায় স্বরণীয় হয়ে থাকলো।

হৃদির চিন্তা ভাবনা....... -

নতুন নতুন আশা নতুন - নতুন ভাষা -
নতুন নতুন পথে পা ফেলা।
নতুন নতুন মানুষকে আজ
সঙ্গে নিয়ে চলা।
এখনও বেকারী বুভুক্ষা - দেশজুড়ে হাহাকার -
অনাদরে শিশু বেড়ে ওঠে লজ্জা স্বাধীনতার।
তাই তো প্রতিনিয়ত পথেই সমবেত
সমাধানের জোট গড়ে তোলা,
নতুন নতুন মানুষকে আজ সঙ্গে নিয়ে চলা।

যে কোনো সংগঠনই সবাই সক্রিয় হয়ে কাজ করেন। কিন্তু যারা কাজ করেন তাদেরকে সবাই মিলে উৎসাহ দিলে কাজটা আরো ভালো জায়গায় পৌঁছে যায়, আরো ভালো হয়। আমরা তাই সবাই মিলে যারা কাজ করছেন তাদের পাশে থাকবো যাতে হৃদি আরো অনেক বড়ো হয়ে আরো মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারে।

এদিন আজি

অর্ণব বশিষ্ঠ

চারপাশ মেতে উঠেছে কি এক কোলাহলে
ওরা বললো .....জানো না আজ তো নববর্ষ।
তা হবে
আমি তো চোখ রাখি না ক্যালেন্ডারে
দিনগুলো আসে আর
করমর্দন করে চলে যায়
তারমধ্যে কোন জন নববর্ষ
আলাদা করে কিছু বুঝিনি

আর একদিন
কোনো কলবর নেই
হঠাৎ চোখে পরলো...........
পাশের বাড়ির দিদি
পরম আদরে খাবার তুলে দিচ্ছে
পথে কুড়িয়ে পাওয়া বৃদ্ধার মুখে।
খাওয়ার শেষে তাঁর ঠোঁটের কোণে
একটুখানি জোৎস্না ফুটে উঠলো

চারদিকে আজ কি সুন্দর মিঠে আলো
ক্যালেন্ডার যাই বলুক
আজ নববর্ষ।

REGD OFFICE :
88, SUBODH GARDEN
BANSDRONI
KOLKATA 700070

REACHES US :

Mobile: 6289465044

Email : bansdronihridi607@gmail.com

Website: www.bansdronihridi.in

BANSDRONI

Hridhi

THE INFORMATION IN THIS BOOK IS TRUE AND COMPLETE TO THE BEST OF OUR KNOWLEDGE. ALL RECOMMENDATIONS ARE MADE WITHOUT GUARANTEE ON THE PART OF THE AUTHOR OR PUBLISHER. THE AUTHOR & PUBLISHER DISCLAIM LIABILITY IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS INFORMATION**